# মৃত্যুবাণ

( ৩য় ভাগ )

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সবুজ সাহিত্য আয়তন
১১২, সাউথ সিঁথি রোড
ঘুঘুডাংগা : ২৪ পরগণা

প্রকাশ করেছেন : লেখকের পক্ষ থেকে সবুজ সাহিত্য আয়তন : ১১২ সাউথ সিঁথি রোড, ঘুঘুডাংগা, ২৪ পরগণা।

ছেপেছেন : মানসী প্রেসের পক্ষে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন : শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্লক ও মুদ্রণ : ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, ৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরিবেশনা : বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪নং বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৫৫।

মূল্য : একটাকা বারো আনা।

# শেষ কথা

মৃত্যুবাণ ( ৩য় ভাগ ) প্রকাশ করা হলো. বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে উপন্যাসটি জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে, এবং বহু চরিত্রের সমাবেশের জন্য ও ঘটনার জটিলতায় উপন্যাসের আখ্যান ভাগ পাঠক পাঠিকাদের কাছে অনেক জায়গায় দুর্বোধ্য ঠেকবে, সেই জন্যই আমার বিশেষ অনুরোধ যেন সমগ্র উপন্যাসটি তাঁরা ধৈর্য সহকারে পড়ে যান, তাহলেই তাঁরা এই বিরাট আখ্যানটির সত্যিকারের রস উপলব্ধি করতে পারবেন। এত বড় বিরাট পবিবেশ নিয়ে আমি ইতিপূর্বে কোন 'অপরাধ তত্ত্বমূলক' আখ্যান রচনা করিনি। মানুষ যে পাপ বা অন্যায় করে, অদৃশ্য মহাশক্তির নির্মম দণ্ড তাকে মাথায় তুলে নিয়ে সময় সময় যে কি ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সমগ্র এই কাহিনীটির মধ্যে সেইটাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

লেখক—

শুভ মহালয়া : ১৩৫১

সবুজ সাহিত্য আয়তন

১১২, সাউথ সিঁথি রোড

ঘুঘুডাংগা : ২৪ পরগণা।

# চরিত্র লিপি

মৃত্যুবান : ( ১ম, ২য় ও ৩য় ) তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট উপন্যাসটির মধ্যে বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ দেখা দিয়াছে, বহু বিচিত্র চরিত্র। পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্যই একটি সম্পূর্ণ চরিত্র লিপি দেওয়া হলো :

| | | |
|---|---|---|
| রাজা যজ্ঞেশ্বর মল্লিক | ... | রায়পুর ষ্টেটের রাজা |
| রাজেশ্বর মল্লিক | ... | যজ্ঞেশ্বরের খুড়তুত ভাই |
| রাজা রত্নেশ্বর মল্লিক | ... | যজ্ঞেশ্বরের একমাত্র পুত্র |
| „ শ্রীকণ্ঠ মল্লিক | ... | রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র |
| কুমার সুধাকণ্ঠ মল্লিক | ... | ঐ মধ্যম পুত্র |
| „ বানীকণ্ঠ মল্লিক | ... | ঐ কনিষ্ঠ পুত্র |
| কাত্যায়নী দেবী | ... | ঐ একমাত্র কন্যা ও নায়েব শ্রীবিলাস মজুমদারের ভ্রাতৃবধূ |
| হারাধন মল্লিক | ... | সুধাকণ্ঠের পুত্র, রায়পুর আদালতের মোক্তার |
| নিশানাথ মল্লিক | ... | বাণীকণ্ঠের পুত্র, শোলপুর ষ্টেটের চিত্র-শিল্পী, বিকৃত মস্তিষ্ক |
| রায় বাহাদুর রসময় মল্লিক | ... | নিষ্পুত্রক রাজা শ্রীকণ্ঠ মল্লিকের দত্তক-পুত্র |
| রাজা বাহাদুর সুবিনয় মল্লিক | ... | ঐ প্রথম পক্ষের পুত্র |
| কুমার সুহাস মল্লিক | ... | ঐ দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র |
| প্রশান্ত মল্লিক | ... | সুবিনয় মল্লিকের একমাত্র পুত্র |
| জগন্নাথ মল্লিক | ... | হারাধন মল্লিকের পৌত্র |

| | | |
|---|---|---|
| সুরেন চৌধুরী | ... | কাত্যায়নী দেবীর পুত্র |
| ডাঃ সুধীন চৌধুরী | ... | ঐ পৌত্র বা সুরেন চৌধুরীর ছেলে |
| সুহাসিনী দেবী | ... | সুরেন চৌধুরীর স্ত্রী |
| মালতী দেবী | ... | ছোট রাণীমা, রসময়ের দ্বিতীয় স্ত্রী |
| দীনতারণ মজুমদার | ... | রাজা যজ্ঞেশ্বরের নায়েব |
| শ্রীবিলাস মজুমদার | ... | দীনতারণের পুত্র ও শ্রীকণ্ঠ ইত্যাদির নায়েব |
| শিবনারায়ণ চৌধুরী | ... | নৃসিংহ গ্রামের নায়েব |
| সতীনাথ লাহিড়ী | ... | রায়পুরের সদর ম্যানেজার ও সুবিনয়ের সেক্রেটারী |
| তারিণী চক্রবর্তী | ... | রায়পুর ষ্টেটের খাজাঞ্চী |
| মহেশ সামন্ত | ... | ঐ তহশিলদার |
| সুবোধ সরকার | ... | ঐ বাজার সরকার |
| হরবিলাস | ... | নৃসিংহ গ্রামের নতুন ম্যানেজার |
| সতীশ কুণ্ডু | ... | ষ্টেটের একজন কর্মচারী |
| ছোট্টু সিং | ... | ঐ দারোয়ান |
| শম্ভু | ... | রাজা সুবিনয় মল্লিকের খাস ভৃত্য |
| মহীতোষ চৌধুরী | ... | ঐ দূর সম্পর্কীয় ভাই |
| ডাঃ কালীপদ মুখার্জী | ... | প্রথিত যশাঃ চিকিৎসক |
| ডাঃ অমিয় সোম | ... | রাজবাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসক |
| বিকাশ | ... | রায়পুর থানার ও. সি. |
| কর্ণেল মেনন | ... | বম্বে প্লেগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ |
| মন্নু | ... | সাঁওতাল সর্দার |
| কিরীটি | ... | রহস্যভেদী |

| | | |
|---|---|---|
| সুব্রত | ... | ঐ সহকারী |
| জাষ্টিস্ মৈত্র | ... | হাইকোর্টের জাষ্টিস্ |
| ভবানীপ্রসাদ | ... | উচ্ছৃংখল বিত্তহীন ধনীর পুত্র |
| ন্যাপা | | |
| বিষ্টুচরণ | ... | ঐ দলের লোক |
| নির্মল | | |
| মিঃ হুড্ | ... | কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার |
| ডাঃ আমেদ | ... | কলিকাতার পুলিশ সার্জেন |

## নীহাররঞ্জনের যে বইয়ের তুলনা নেই ঃ—

| | | |
|---|---|---|
| বিদ্রোহী ভারত ( ১ম পর্ব ) ( তৃতীয় সংস্করণ ) | | ৩।৷৹ |
| ঐ | ( ২য় পর্ব ) | ৩৸৹ |
| কালোভ্রমর ( ১ম ভাগ ) ( সপ্তম সংস্করণ ) | | ২।৹ |
| ঐ | ( ২য় ভাগ ) ( ঐ ) | ২৷৷৹ |
| রক্তলোভা নিশাচর ( কালোভ্রমর ৩য় ভাগ ) ( ৪র্থ সংস্করণ ) | | ২।৹ |
| নিশাচর বাজ ( কালোভ্রমরের শেষ পর্যায় ) ( যন্ত্রস্থ ) | | |
| মৃত্যুবাণ ( ১ম ভাগ ) | | ১৸৹ |
| ঐ | ( ২য় ভাগ ) | ১৸৹ |
| ঐ | ( ২য় ভাগ ) | ১৸৹ |
| আমাদের শরীরের গল্প ( গল্পে শরীর বিজ্ঞান ) | | ২৷৷৹ |

# মৃত্যুবাণ

## ( ৩য় খণ্ড )

—এক— —ভৌতিক আবির্ভাব—

সেদিন যেখানে আমার কাহিনী শেষ হ'য়ে গেল ভেবেছিলাম, সেই সমাপ্ত কাহিনীর জের কেন যে আবার টানতে হলো, সে কথা বলতে গেলে, বর্ত্তমানের এই কাহিনীতেই আবার সকলকে নিয়ে আসতে হয়।

* * জাষ্টিস্ মৈত্র আবার কিরীটির লেখা সুদীর্ঘ চিঠিখানার শেষাংশের 'পরে মনোনিবেশ করলেন: মোটামুটি তাহলে আপনাকে রায়পুরের সমগ্র হত্যা-মাম্লাটির একটা মীমাংসা (?) করে দিলাম এবং এখন বোধহয় আপনার আর বুঝতে কষ্ট হবে না, হতভাগ্য রায়পুরের ছোটকুমার সুহাসমল্লিকের হত্যার পরিকল্পনাকারী স্বয়ং রাজা বাহাদুর—নিহত সুহাসের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবিনয় মল্লিকই।

পরিকল্পনাকারী ডাঃ কালীপদ মুখার্জ্জী ও হত্যার যন্ত্র (instrument) উদ্ভাবনকারী সতীনাথ লাহিড়ী। আসলে

উপরিউক্ত তিনজন,—রাজাবাহাদুর, ডাঃ কালীপদ মুখার্জী ও সতীনাথ লাহিড়ী প্রত্যেককেই সুহাসের হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

রাজাবাহাদুরের খুল্লতাত নিশানাথ ও সেক্রেটারী সতীনাথের হত্যাকারী স্বয়ং রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক, এবং তার এহত্যার উদ্দেশ্য : তাদের মধ্যে নিশানাথ ছিলেন সতীনাথের হত্যাব্যপারে স্বাক্ষী, আর সতীনাথ ছিলেন সুহাসের হত্যাকারীর সংগী-সহ-উদ্যোক্তা ও অন্যতম পরিকল্পনাকারী, এই হত্যামাম্‌লা সংক্রান্ত যাবতীয় সবকিছুই আপনার গোচরীভূত করলাম ও সেই সংগে এদের প্রত্যেকের জবানবন্দী ( যা আমি সংগ্রহ করেছি ) এবং অন্যান্য evidenceগুলোও সব একত্রে আপনার নিকট পাঠালাম। ধর্মাধিকরণের হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে এবারে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতা হ'তে কিছুদিনের জন্য চলে যাচ্ছি। অদূর ভবিষ্যতে এই হত্যামাম্‌লার চমক্‌প্রদ ফলাফল দূর হ'তে দেখবার বুকভরা আশা নিয়ে। আশা করি নিরাশ হবো না।

নমস্কার। ভবদীয় ; কিরীটি রায়।

এই সংগে কয়েকদিন আগে প্রাপ্ত সুবিনয় মল্লিকের শেষ স্বীকারোক্তিটুকুও না পড়ে পারা যায় না।

শেষ পর্যন্ত লোকটার উদ্ধত স্বীকৃতির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে যে উলংগ আত্মপ্রত্যয় ও জঘন্য পাশবিক হিংস্রতা ফুটে উঠেছে, তা যেমন ভয়ংকর তেমনই কুৎসিত।

একদা পূর্বপুরুষের রক্ত হ'তে যে বিষ তার দেহের রক্ত

স্রোতে সংক্রামিত হয়েছিল, তারই ঋণশোধ করতে গিয়ে যেন সে দেউলিয়া হ'য়ে গেল।

হতভাগ্য সুহাসকে হত্যা করাতে গিয়ে যে নৃশংস নাগপাশ সে বিস্তার করেছিল, তারই অটুট বন্ধনে নিজের অজ্ঞাতে যেন সে নিজেই জড়িয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তির আর কোন পথই খুঁজে না পেয়ে রঙ্গমঞ্চ হ'তে অতর্কিতে সবার অলক্ষ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে একপ্রকার বাধ্য হলো।

নির্মম নিয়তির বিধান।

একই পিতার রক্ত মাংসে জন্ম নিয়েও, ভাই হয়ে ভাইয়ের জীবনান্ত ঘটিয়েও যে এতটুকু লজ্জিত বা দুঃখিত নয়, অদৃশ্য কঠোর ভাগ্য বিধাতা এমনি করেই তার সাজান বাগান পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে নিঃস্বভিখারী করে ছেড়ে দিলেন।

* * *

উইলটা আমি সংগে করেই নিয়ে গেলাম : জাষ্টিস্ মৈত্র পড়তে লাগলেন পলাতক সুবিনয়ের স্বীকারোক্তির শেষাংশটুকু ; কারণ আমার সকল প্রচেষ্টাই যখন ভাগ্যদোষে ব্যর্থ হলো, এবং আমার ভোগে যখন সম্পত্তি এলোই না তখন যাতে সেটা নিয়ে আর কোন উপদ্রব না ঘটে, সেই জন্যই উইলটা সংগে নিয়ে গেলাম। Adieu.

বিনীত

সুবিনয় মল্লিক

আশ্চর্য ! লোকটার কথা যতই ভাবা যায় যেন বিস্মিত হতে হয়।

কি জানি কি ধাতু দিয়ে লোকটা গড়া।

'সুহাসকে আমিই হত্যা করিয়েছি। হ্যাঁ। হত্যা করিয়েছি এই জন্য যে এই পৃথিবীতে আমার তার মত শত্রু আর ছিল না, শুধু এ জন্মেই নয়; আগের জন্মেও তাকে আমি হত্যা করিয়েছি এবং পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে পরজন্মেও তাকে আমি হত্যা করাবো। এই আমার দৃঢ় সংকল্প।

অর্থের লোভে মানুষ কত নীচে নেমে যেতে পারে, সুবিনয় মল্লিক যেন তার জাজ্বল্যমান এক দৃষ্টান্ত। মানুষের যে কত রূপ, ভাবতেও বিস্ময় জাগে।

*　　　*　　　*

আরো দীর্ঘ আট বৎসর পরের কথা।

পুনর্বিচারে দীপান্তরের আসামী ডাঃ সুধীনচৌধুরীর মুক্তি হয়েছে সসম্মানে।

সে আবার প্র্যাকটীস্ সুরু করেছে, তবে কলকাতায় নয়, রায়পুরেও নয় সুদূর বেনারসে গিয়ে। সুধীনের মা ও বিকৃত মস্তিষ্ক পিতাও তার কাছেই আছেন।

রায়পুরের বিশাল রাজবাটি এখন একপ্রকার খালি বললেও চলে, কারণ পলাতক আত্মগোপনকারী সুবিনয়ের একমাত্র বংশধর পুত্র প্রশান্ত কলকাতায় তার মামা ভবেশ বাবুর তত্ত্বাবধানে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনা করছে, এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে।

রায়পুরের সম্পত্তি এখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে।

সুবিনয় মল্লিকের কোন সন্ধানই কেউ আজ পর্যন্ত পায়নি।

পুলিশের গুপ্তচর ও গোয়েন্দাবিভাগ শত চেষ্টাতেও সুবিনয়ের কোন সন্ধানই পায়নি। আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি হতভাগিনী ছোট রাণীমা মালতী দেবীর।

এই খানেই আজিকার এই বর্তমান কাহিনীর সুরু।

*　　*　　*

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশ: প্রশান্তর ইচ্ছা সে রায়পুরে একবার যাবে। অনেকদিন সেখানে যায় না ও।

প্রশান্তর বয়স পনেরো পেরিয়ে এই ষোলোয় পড়েছে।

দীর্ঘ উন্নত, বলিষ্ঠ, সুশ্রী চেহারা।

অত্যন্ত অমায়িক মিশুকে ব্যবহার হওয়া সত্বেও সে কারও সংগেই বড় একটা মেলামিশা করে না। ভবেশ বাবু ভাগ্নের কথা শুনে বললেন: রায়পুরে একদিন তুমি যেতে চাও খুব ভালই, আজ না গেলেও একদিন তোমাকে সেখানে গিয়ে সব কিছুর নিজের হাতে ভার নিতে হবেই, সেই ত তোমার জন্মস্থান, পৈতৃক ভিটা।

আগে না বুঝলেও প্রশান্ত এখন বেশ বুঝতে পারে।

সে তখন ছোট হলেও একেবারে ছোট্টটি ছিল না।

পিতার সংগে তার পরিচয় খুব সামান্যই; অস্পষ্ট স্মৃতি ধোঁয়ার মত: কিন্তু সেই ধোঁয়াটে স্মৃতির মধ্যে যে মুখখানি আজিও তার মনে পড়ে, সেটা খুব আনন্দ বা সুখের নয়।

স্কুলের সহপাঠিরা তাকে স্পষ্ট ভাবে কিছু না বললেও আকারে ইংগীতে যে ভাব এখনও প্রকাশ করে, সেটাও খুব আনন্দ বা সুখের নয়।

সে যে নৃশংস ভ্রাতৃহত্যাকারী রায়পুরের পলাতক রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকেরই ছেলে একথা সে নিজে ভুলতে চাইলেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কোন দিনই তাকে ভাল করে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যেন সে কথা ভুলতে দেয়নি।

সুস্পষ্ট ভাবে না বললেও, আকার ইংগিতে তারা যেন সবাই বলছে এবং আজও বলে: এ সেই criminalয়ের ছেলে।

দুঃখে বেদনায় আত্মগ্লানিতে এক এক সময় প্রশান্তর ইচ্ছা হয়েছে, মানুষের এই সমাজ ও লোকালয় ছেড়ে যে দিকে দু'চক্ষু যায় পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে।

সতত নীরব ইংগীতময় সুপষ্ট অপমানের এ জ্বালা বহন করে বেড়াবার চাইতে মৃত্যুও ভাল। এই সব কারণেই সে সকলকে এড়িয়ে চলে।

খেলার মাঠেও দশজনের মধ্যে প্রশান্তকে খুব কমই দেখা যায়।

প্রশান্তর মামা ভবেশ বাবুও যে সেকথা জানেননা তা নয়।

ভাগ্নেকে তিনি সত্যিই সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেন ভালবাসেন ও সর্বদা স্নেহ দিয়ে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ান।

মুখ ফুটে প্রশান্ত কোন দিন কাউকে কিছু না বললেও তার ডাগর দুটি চোখের ভাষাময় ছলছল চাউনিকে এড়ান সত্যিই দুষ্কর।

শুধু দীর্ঘ অবকাশ বলেই নয়, প্রশান্তর রায়পুরে একটিবার যাওয়ার অন্য একটি কারণও ছিল। কয়েকদিন আগে বাংলা

সংবাদপত্রের পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা সংবাদ তার দৃষ্টি ও মনকে আকৃষ্ট করেছে :

সংবাদটা ছিল এই :

রায়পুরের বিখ্যাত হত্যামাম্‌লার কথা আজও হয়ত দেশবাসী ভোলেনি কেউ।

রায়পুরের সুবিশাল প্রাসাদ এখন এক প্রকার জনহীনই পড়ে আছে দীর্ঘ কয়েকবৎসর ধরে। প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে একটি উড়েমালী ও রায়পুরের পলাতক রাজা বাহাদুরের পুরাতন ভৃত্য শম্ভু।

শোনা যাচ্ছে অভিশপ্ত রায়পুরের প্রাসাদে নাকি কিছুকাল ধরে নানা প্রকার অশরিরীর আবির্ভাব ঘটছে।

সারাটা রাত্রি ধরে কারা যেন কেবল কাঁদে আর কাঁদে, বিনিয়ে বিনিয়ে আকুল স্বরে। শুধু তাই নয়, কখনো আবার সুমধুর বাজনার শব্দও শোনা যায়।

আচম্‌কা ঝোড়ো হাওয়ার মত উচ্চ হাসির শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় লোকেরা অনেকে নাকি দেখেছে : জ্যোৎস্না রাত্রে, যখন চারিদিক চাঁদের আলোয় ভেসে যায়, এক দীর্ঘ শ্বেতবস্ত্র পরা ছায়ামূর্তি ছাতের প্রাচীরের পরে মধ্যে মধ্যে হেঁটে বেড়ায়।

অনেক হত্যা ঐ প্রাসাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এও হয়ত সেই নিহত কোন হতভাগ্যের পিপাসু আত্মা আজও মাটির পৃথিবীর মায়াবন্ধন কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি,

তাই রাতের আলোছায়ায় ঐ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

অভিশপ্ত রায়পুরের রাজপ্রাসাদ! আজ যেন আবার নতুন রহস্য নিয়ে সজীব হয়ে উঠ্ছে।

স্থানীয় নিজস্ব সংবাদদাতা

সংবাদটা যে শুধু প্রশান্তরই মনে রেখাপাত করেছে তা নয়, আর একজনের মনেও কৌতুহল জাগিয়েছে। সে ভূত, প্রেত, দানা দৈত্য অশরিরী যাবতীয় অসম্ভব কল্পনাকে কোন দিনই সত্য বলে মনে স্থান দেয়নি।

পৃথিবীতে অদেহী আত্মার হয়ত আবির্ভাব ঘটে। কারণ যে পঞ্চভূতে মানুষের শরীর গঠিত, মৃত্যুর পরও যখন সেই পঞ্চভূতেই আবার সেই দেহ মিশিয়ে যায় তখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যখানে কোথায়ও কোন একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ থাকাটা হয়ত এমন কিছু অনিশ্চয়তা বা অবিশ্বাস্য নয়।

তবু সাধারণ মানুষের মনে যে ভূতপ্রেত ও অদেহীর একটা সম্ভবনার কল্পনা আছে, এবং যে কল্পনাকে ভিত্তি করে সত্য মিথ্যা অনেক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে ও পড়ছে কত ভাবে সেটাকে ও সত্য বলে নিঃসংশয়ে মেনে নিতে যেন তার বুদ্ধি, বিচার ও যুক্তি সাড়া দেয় না।

কারণ সত্যিই পরলোক ও অশরিরী বলে কিছু যদি থাকেই তারা আর যাই হোক একবার মৃত্যুর অন্ধকারে গিয়ে আবার পৃথিবীর লোকচক্ষুর সামনে এসে ভয় দেখিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলতো না।

আশ্চর্য এই যে এই ধরণের বেশীর ভাগ কাহিনীই শেষ পর্যন্ত অসম্ভব মিথ্যায় পরিণত হয়েছে বা কোন শয়তানের শয়তানীর অপচেষ্টায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কৌতূহলটা হয়ত সেই জন্যই উদ্রিক্ত হয়ে উঠেছে তার।

রায়পুরের কথাত' সে সত্যিই আজও ভুলতে পারেনি। এবং সেই সংগে আজও একটা কঠোর সত্য যা সে কোন মতেই অস্বীকার করতে পারে না; রাজাবাহাদুর পলাতক সুবিনয় মল্লিকের মৃত্যুসংবাদ।

যদিচ পুলিশের রিপোর্টে গত বৎসরে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

সে নিজে আসানসোলে গিয়ে সুবিনয়মল্লিক নামে সনাক্ত মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখে এসেছিল।

তবু সে নিঃসংশয়ে সেই মৃতব্যক্তিকে সুবিনয়মল্লিক বলে মেনে নিতে পারেনি। যদিচ সে ঐ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করেনি।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই: রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের আত্মগোপনের বছর খানেক প্রায় 'পরে আসানসোলের এক কয়লার খনির ম্যানেজার তার কোয়ার্টারে নৃশংস ভাবে নিহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করার সময় তার পলাতক সেক্রেটারীর কোন সন্ধান না পেয়ে সেক্রেটারীর প্রতি সন্দেহযুক্ত হ'য়ে ওঠে। আশে পাশে সর্বত্র পুলিশের লোকেরা হন্যেকুকুরের মত সেক্রেটারী বিধুবাবুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

অবশেষে পরের দিন ষ্টেশন হ'তে অল্পদূরে একটা ডোবার সামনে বিধুর সন্ধান পায়। প্রথমে বিধু পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনপ্রকার সুবিধা না পেয়ে রিভলভার চালায়, পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়।

পুলিশের গুলির আঘাতেই শেষ পর্যন্ত বিধুর মৃত্যু হয়।

মৃত বিধুর পকেটে নগদ পাঁচহাজার টাকার নম্বরী নোট ও খানকয়েক চিঠিপত্র পাওয়া যায়। চিঠির শিরোনামায় লেখা ছিল সুবিনয় মল্লিক, রাজাবাহাদুর রায়পুর।

মৃতদেহ নিয়ে পুলিশ মহলে অত্যন্ত সাড়া জাগে। কিরীটিও সংবাদ পেয়ে আসানসোলে যায়। পলাতক রাজা-বাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের অস্তিত্ব সম্পর্কে এইখানেই যবনিকা পাত হয়, বিধু ওরফে রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের মৃত্যুর সংগে সংগে।

* * *

সংবাদপত্রে রায়পুর সম্পর্কে শেষ সংবাদটা সত্যিই তাকে চঞ্চল করে তোলে। এবং শেষপর্যন্ত সে রায়পুরে একটিবার ঘুরে আসবে, এবং স্বচক্ষে ব্যাপারটা ভালকরে দেখে ও শুনে আসবে স্থির করে।

* * *

'প্রশান্ত, তাহলে তুমি যাওয়াই স্থির করলে রায়পুরে ?

হাঁ মামাবাবু।

কিন্তু সেখানে গিয়ে উঠ্‌বে কোথায় ?

'কেন, প্রাসাদেই ; কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার মিঃ

উড্ কে আপনি একটা চিঠি লিখে দেন যে আমি দু'একদিনের মধ্যেই রায়পুরে যাচ্ছি এবং প্রাসাদেই যেন আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়।

'বেশ আজই আমি লিখে দিচ্ছি চিঠি, ভবেশ বাবু ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

**—দুই—** **—আবার রায়পুরের পথে—**

জন কোলাহল মুখরিত হাওড়া ষ্টেশনকে পশ্চাতে ফেলে মেল ট্রেনখানা এগিয়ে চলে। গ্রীষ্মরাত্রি, রাত্রি নয়টা মাত্র বেজেছে।

কয়দিন হতেই এত প্রচণ্ডগ্রীষ্ম পড়েছে; প্রাণ যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠে।

চলমান গাড়ীর খোলা জানালা পথে হাওয়া আসছে; আঃ শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। একটা সেকেণ্ডক্লাশ কুপে; দু'জন মাত্র যাত্রী।

প্রশান্ত মল্লিক আর একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকটির বেশ বলিষ্ঠ পেশলগঠন, সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফ্রেঞ্চ্‌কাট্ দাড়ি, পাকানো সরু গোঁফ।

চোখে কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা।

পরিধানে ঢোলাপায়জামা, ঢোলাপাঞ্জাবী, মাথায় আদ্দির টুপি।

মুখে একটি জ্বলন্ত সিগার।

যদিচ ভদ্রলোক হাতের 'পরে একখানা ইংরাজী উপন্যাস মেলে ধরে রেখেছেন, দৃষ্টিটা কিন্তু অদূরে উপবিষ্ট, একটি গল্প-পুস্তকে অভিনিবিষ্ট প্রশান্তর দিকেই বার বার গিয়ে পড়ছে।

মুখের 'পরে একটা আশ্চর্য পরিচিত মুখের ছাপ।

এ মুখ যেন ভদ্রলোক কোথায় দেখেছেন; মনে পড়ছে না'ত'? অথচ খুব চেনা। স্মৃতির পাতা আলোড়িত হতে থাকে।

রাত্রি দশটায় বর্দ্ধমানে গাড়ী এলো।

ভদ্রলোক কুপে হ'তে প্ল্যাট্‌ফরমের 'পরে নামলেন, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, একটু চা না হলে আর চলছে না।

আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল, গাড়ীর দরজায় ঝুলন্ত কার্ডে যাত্রীর নামটাও দেখা প্রয়োজন একবার।

ঃ প্রশান্ত মল্লিক; কলিকাতা টু রায়পুর।

চকিতে যেন স্মৃতিরপটে বিজলী খেলে যায়।

হাঁ, অনুমান ঠিকই তার।

রায়পুরের রাজপরিবারেরই কেউ।

চা পান করে ভদ্রলোক আবার যখন গাড়ীতে এসে উঠলেন, গাড়ী তখন আবার ধীরে ধীরে চলতে সুরু করেছে প্ল্যাট্‌ফরম ছাড়িয়ে নিজ গন্তব্যপথে।

ভদ্রলোক আড়চোখে একবার প্রশান্তের দিকে তাকালেন; পুস্তকের মধ্যে গভীর ভাবে নিবিষ্ট ছেলেটি।

গাড়ী চলেছে হু হু করে ছুটে।

গ্রীষ্মরাত্রির নক্ষত্রখচিত, পরিষ্কার আকাশ ; চাঁদ উঠ্‌তে এখনো অনেক দেরী। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে আলোছায়া ঘেরা দূর গ্রামরেখা অস্পষ্ট মায়াময় মনে হয়। মধ্যে মধ্যে গাছপালাগুলো অন্ধকারে স্তূপ হয়ে আছে, তাতে অসংখ্য জোনাকীরআলো যেন আলোর ফুলকি ছড়াচ্ছে।

ভদ্রলোক হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, রাত্রি দশটা বেজে ৩৫ মিনিট।

আচম্‌কা প্রশান্ত ভদ্রলোকের প্রশ্নে চম্‌কে পাঠ্যপুস্তক হ'তে মুখখানা তোলে।

'কোথায় যাবেন আপনি ?

'রায়পুর।

'তাই নাকি, ভালই হলো আমিও রায়পুরেই যাচ্ছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আপানার নিশ্চয় ব্যায়াম করা অভ্যাস আছে ?

'হাঁ, কেন বলুন ত ?' এবারে কৌতূহল ভরে প্রশান্ত প্রশ্নকারীর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকায়।

সত্যিই প্রশান্ত নিয়মিত ব্যায়াম করে, এবং নিয়মিত ব্যায়ামের ফলেই বয়েসের অনুপাতে তার দেহটা একটু বেশী পেশল ও উন্নত।

'আজকাল বয়েস হয়ে গেছে, আমিও এককালে নিয়মিত ব্যায়াম করতাম কিনা ? আপনার চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায় আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন !

'আচ্ছা, আপনার বয়স কত হবে ? এবারে প্রশান্ত প্রশ্ন করে।

'কত বলে আপনার মনে হয়? স্মিতভাবে ভদ্রলোক প্রশান্তর মুখের দিকে তাকায়।

'এই, ত্রিশ বত্রিশ হবে।

'না, বিয়াল্লিশ চলছে আমার।

'সত্যি! কিন্তু আপনাকে দেখলে কিন্তু তা একেবারেই মনে হয় না। প্রশান্ত বলে।

অল্পসময়ের মধ্যেই দু'জনের আলাপটা চমৎকার জমে উঠে।

ভদ্রলোকের নাম ধূর্জটিপ্রসাদ রায়। এক বেসরকারী কলেজের প্রফেসার।

হঠাৎ কথোপকথনের মধ্যে একসময় প্রশান্ত ধূর্জটিবাবুকে বলে 'যদিও আমি কলকাতায়ই থাকি রায়পুরেই কিন্তু আমার বাড়ী।

'রায়পুরের সংগে আমার কিছুটা পরিচয় আছে, কোন্ বাড়ী বলুন ত' আপনাদের?

'আমি রাজবাড়ীতেই যাবো, সেই আমার বাড়ী।

রায়পুরের মল্লিক রাজাদের বাড়ী মানে 'রায়পুরের বিখ্যাত হত্যামাম্‌লা যে বাড়ীকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল?

'হাঁ! রাজাবাহাদুর স্বর্গত সুবিনয় মল্লিকই আমার পিতা।

'ওঃ।

* * *

ঘুম যেন আজ কারও চোখেই নেই।

আবার একসময় ধূর্জটিবাবু বলেঃ আচ্ছা প্রশান্ত

বাবু, আপনাকে একটা কথা বলবো যদি আপনি মনে কিছু না করেন।

'নিশ্চয়ই না, বলুন কি বলবেন! সংকোচ করছেন কেন?

'কিছুদিন আগে রায়পুরের আপনাদের প্রাসাদ সম্পর্কে একটা সংবাদ দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল বোধ হয় দেখে থাকবেন প্রশান্ত বাবু, ভূত প্রেত সম্পর্কে আমি আবার চিরদিনই একটু interested কিনা!

'কেন বলুন ত'?

কারণ এধরণের ব্যাপারে কোন দিনই আমার তেমন বিশ্বাস নেই, বিশেষ করে রায়পুরের রাজপ্রাসাদ মানুষের কাছে এত বেশী পরিচিত যে, ওই প্রাসাদকে কেন্দ্রকরে এধরণের কোন সংবাদ রটনা হওয়ায় সত্য মনে সন্দেহ জাগায়, এবং সত্যি বলতে কি আমার রায়পুরে যাওয়ার উদ্দেশ্যই তাই, একবার দেখবো ব্যাপারটা আসলে কি!

সত্যি 'ধূর্জটি বাবু আপনাকে তাহলে খুলেই বলি, আমিও সেই কারণেই বিশেষকরে রায়পুরে যাচ্ছি, যদিচ রায়পুর জায়গাটা একবার ভালকরে ঘুরে দেখবারও ইচ্ছা আছে, কেননা ভাল করে জ্ঞান হওয়া অবধি আর রায়পুরে আমার যাওয়াই হয়ে ওঠেনি।

'এ দেখছি এক প্রকার ভালই হলো। দেখুন প্রশান্ত বাবু, আমার মাথায় একটা idea এসেছে। If you like it!

'কি বলুন ত'?

আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা যে 'ভূতের রহস্য' ভেদ করতে যাচ্ছি রায়পুরে কাউকে তা জানতে দেব না আগে থেকে।

'তা কেমন করে হবে বলুন! আমার যাওয়ার কথাত আগে হতেই মামাবাবু ওখানকার ম্যানেজার মিঃ উড্কে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন।

'বেশ, আপনার কথা না হয় সেখানকার লোকে জানাবে, আমাকেত কেউ চেনে না। আমি আপনার গার্জেন টিউটারের পরিচয়ে সেখানে যাব'। অবিশ্যি আপনাকে সেখানকার লোকেরা চিনলেও, কেন যে আসলে আপনি সেখানে যাচ্ছেন তা, কেউই জানতে পারবে না। কাজেই we can work together hand in hand and secretly.

'মন্দ আইডিয়া নয়। বেশ interesting হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রশান্ত অত্যন্ত উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। তাহলে আপনি অন্য কোথাও না উঠে, আমাদের ওখানেই উঠুন না কেন?

'বেশত!...'

এর পর নানা জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। স্থির হ'লে ধূর্জটিবাবু প্রশান্ত মল্লিকের গার্জেন টিউটারের পরিচয়েই সেখানে একেবারে রাজপ্রাসাদে গিয়ে প্রশান্তর সংগে সংগেই উঠ্বে। এতে করে তাকে যেমন কেউ সন্দেহ করবে না, তেমনি একেবারে অকুস্থানে গিয়ে হাজির থেকে রহস্যের অনুসন্ধান করাও চলবে নির্বিঘ্নে।

গ্রীষ্মরাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল।

মেলট্রেনখানা ষ্টেশনে এসে থেমেছে, এখানে নেমে প্রশান্ত ও ধূর্জটিবাবু বাকী পথটা রাজবাড়ীর টম্‌টমে যাবেন।

রাতের আকাশ নিশিশেষে ফিকে হয়ে আসছে।

ওই দূরপ্রান্তে আলোছায়াভরা আকাশে শুকতারাটা বড় সুন্দর দেখায়। ঝির ঝির করে বইছে রাত্রিশেষের হাওয়া, শরীর ও মন যেন জুড়িয়ে যায়।

ক্লান্ত গ্রীষ্মরাত্রির অবসানে আশেপাশের গাছপালা গুলো কেমন অস্পষ্ট আবছা মনে হয়। পশ্চিমআকাশে দেখা যায় অস্পষ্ট একটা মেঘের সম্ভাবনা।

কোথায় কোন বৃক্ষের পত্রান্তরাল হতে হঠাৎ একটা রাত জাগা পাখী ডেকে উঠে।

আশ্চর্য এই পৃথিবী!

এই রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে একে যেন চেনাও যায় না : মানুষের সংগে যেন এর কোন পরিচয়ই নেই। অচেনা অপরিচিত আবছা করুণ!

টম্‌টম্ নিয়ে ষ্টেটের একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান এসেছে।

টম্‌টম্ ধীর মন্থর গতিতে ছুটছে : টুং টাং করে বাজছে ঘোড়ার গলার ঘণ্টাটা। মন্থর ক্লান্তিতে যেন ভরা।

পথের দু'পাশে রুক্ষ পিঙ্গল মাঠ অনুর্বর।

'কেমন লাগছে প্রশান্ত?'

প্রশান্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল : কি ভালই যে লাগছে তার।

খুব ভাললাগছে ধূর্জটি বাবু! মৃদুস্বরে প্রশান্ত জবাব দেয়।

গ্রামও নয় আবার পুরোপুরি সহরও নয় এই রায়পুর, দু'য়ের মাঝামাঝি।

দেশটা রুক্ষ্ম হলেও এর যেন একটা উদাস মধুর রূপ আছে।

রাজবাড়ীত আপনি দেখেছেন, এখনও কতদূর বলতে পারেন ?

ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল আষ্টেক হবে। এখনও প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় নেবে পৌঁছাতে।

* * *

মিঃ ফিলিপ্ হুড্ ম্যানেজার, লোকটি সত্যি চমৎকার।

বয়সটা প্রায় ষাটের কাছাকাছি।

সিভিল সার্ভিস্ নিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম যৌবনে এসেছিলেন, রিটায়ার করবার পরও বিলাতে ফিরে যাননি।

বাকী জীবনটাও ভারতেই কাটিয়ে দেবেন মনস্থ করেছেন।

ব্রহ্মচারী মানুষ, বিয়ে-থা করেননি। সংসারে এক বুড়ী মা ছিল, অনেকদিন মারা গেছেন, বন্ধনও নেই কিছু। তাই হয়ত পিছুটানও নেই।

আসলে হুডের জন্মই ভারতবর্ষে।

জন্মাবার পর বছর দুই বয়সে মার সঙ্গে বিলাত চলে যান, তার পর আবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে চাকুরী নিয়ে ভারতে আসেন।

হুডের পিতা মিঃ জন হুড্‌ ভারতবর্ষেই মারা যান, পাটনাতে চাকুরী স্থলে রিটায়ার করবার পর হুড্‌ তাঁর এক বন্ধুর পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন ঃ ভারতবর্ষই আমার আসল জন্মভূমি। আমার পিতা এখানকার মাটিতে শেষনিশ্বাস নিয়েছেন, আর আমি নিয়েছি প্রথমনিশ্বাস, I like India, I love India.

যাহোক মোটের উপর মিঃ হুড্‌ ভারতবর্ষেই তাঁর বাকী জীবনটা অতিবাহিত করতে মনস্থ করেছেন। কলকাতায় একখানা বাড়ীও করেছেন।

ইচ্ছা আছে মৃত্যুর পর উইল করে যাবেন, সেই বাড়ীতে একটা বয়েজ নার্শিংহোম বসাবেন।

পূর্বাকাশে প্রথম অরুণ আলোর প্রকাশের সংগে সংগে টম্‌টমটা রাজপ্রাসাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

মিঃ হুড্‌ স্বয়ং রাজকুমারের অভ্যর্থনা করবার জন্য গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রোগাটে দেহের গঠন, উচুঁ লম্বা ঃ মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া শ্বেতশুভ্র চুল, বাতাসে উড়ছে। পরিধানে শাদা জিনের হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ ও হাফ্‌সার্ট।

হাতে একটা মোটা লাঠি।

প্রশান্ত হাসিখুসি মুখখানা।

কলস্বরে মিঃ হুড প্রশান্তকে অভ্যর্থনা জানালেন ঃ glad to see you my boy. Thousand welcome !…

Good morning Mr Hood !

ধূর্জটির দিকে হুড্‌কে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে প্রশান্ত নিজেই ধূর্জটির নির্দেশমত পরিচয় দেয়ঃ আমার গার্জেন টিউটর মিঃ ধূর্জটি রায়।

How do you do! হুড্‌ করমর্দনের জন্য হস্তপ্রসারিত করে দেয়।

প্রথম আলাপ সমাপ্ত হয়। এবং প্রথম আলাপেই প্রশান্ত ও ধূর্জটি মিঃ হুডের সরল নিরহংকার অমায়িক মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। হুড্‌ বলেঃ জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগে মিঃ মল্লিক। সহরের ঝামেলা বা কোলাহল নেই। বিকালের দিকে নদীর ধারে পায়ে হেঁটে বেড়াতে যাই। তোমাদের ষ্টেটের নৃসিংহগ্রাম মহালটি সত্যিই চমৎকার, সেখানে যেতে একটা শালবন ও জংগল পথে পড়ে, প্রচুর শিকারের উপকরণ আছে। Do you like hunting?

শিকার ত' দূরের কথা, বন্দুক ব্যবহারেরই আজ পর্যন্ত কোনদিন সুযোগ পায়নি; প্রশান্ত মৃদুহেসে জবাব দেয়ঃ হাঁ, শিকার আমার খুব ভাল লাগে, তবে আজ পর্যন্ত সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

বেশ আমার দু'টো রাইফেল আছে, একদিন শিকারে যাওয়া যাবে, মিঃ রায় আপনারও কি শিকারের অভিজ্ঞতা নেই?

সামান্য আছে।

* * * *

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সেদিনটা বিশ্রামেই কেটে গেল, ধূর্জটি ও প্রশান্তর পরে গোপনে পরামর্শ করে স্থির হলো, পরের দিন দুপুরে সমস্ত রাজবাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখবে।

বিকালের দিকে ধূর্জটি একা একা শহরে বেড়াতে চলে গেছে।

প্রশান্ত প্রাসাদেই আছে।

দোতালায় যে ঘরখানিতে নিশানাথ থাকতেন সেই ঘরেই প্রশান্ত ও ধূর্জটির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভৃত্য শম্ভু এসে ঘরে প্রবেশ করল।

শম্ভুর বয়স হয়েছে ঃ পঞ্চান্ন বৎসর পার হয়ে গেছে। মাথার তিনের চার অংশ চুল পেকে শাদা হয়ে গেছে।

দেহে দেখা দিয়েছে বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ! গালের ও ও কপালের চামড়া গেছে কুচ্‌কে ঃ চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে।

রাজাবাবু, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে আজ রাত্রে কি রান্না হবে? লুচি হবে কি?

না ভাতই রাঁধতে বল? শম্ভু?

আজ্ঞে।

তুমি আমাকে রাজাবাবু বলে ডাক কেন?

আজ্ঞে আপনিই যে এখন রায়পুরের রাজাবাবু। আজ না হলেও দু'দিন বাদেও আপনিই ত সব কিছুর মালিক হবেন।

সে যখন হই হবো, এখন তাই বলে তুমি আমাকে

রাজাবাবু বলে ডাকতে পারবে না ; আর আমিও তোমাকে শম্ভুদা বলে ডাকবো, বাবার খুব প্রিয় ছিলে তুমি।

শম্ভুর ঘোলাটে চোখে জল ভরে আসে! মুখটা ফিরিয়ে সে অশ্রু গোপনের চেষ্টা করে : তাই হবে রাজাবাবু! এই বাড়ীতে আমার জীবনের ত্রিশটা বছর কেটে গেল। আপনার ঠাকুর্দা রায় বাহাদুর রসময় মল্লিকের সময় এ বাড়ীতে প্রথম চাকুরী নিয়ে আসি আমি, তখন আপনার বাবা আপনার চাইতে কয়েক বছর বড় হবেন মাত্র। কলকাতায় কলেজে পড়তেন। তারপর দেখতে দেখতে সোনার সংসারে আগুণ লাগল, পুড়ে সব ছাই হ'য়ে গেল, আমারই চোখের সামনে। সে সব দিনের কথা ভাবলেও বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে।

তুমি ঠাকুরকে রান্নার কথা বলে এখানে এস শম্ভুদা! তোমার কাছে এ বাড়ীর গল্প শুনবো।

সে দুঃখ ও কষ্টের কাহিনী আর নাই বা শুনলে রাজাবাবু।

শম্ভু ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আজকাল আর ডায়নামোতে প্রাসাদে বাতি জ্বলে না।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার চারিদিকে ঘন হ'য়ে আসছে।

এতবড় প্রাসাদটা যেন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোছায়ায় কেমন নিঃস্ব রিক্ত মনে হয়।

একদিন এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কত হাসি গল্প ও কতজনের পদশব্দে সর্বদা মুখরিত থাকত, আজ যেন সব কিছু নিঃশেষে স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে।

শম্ভু একটা সেজবাতি জ্বালিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

*　　　　*　　　　*

চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

কোথায়ও সামান্য সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই।

একেবারে নিঝঝুম্!…প্রাসাদত' নয় যেন বিশাল এক কবরখানা।

ঘরের আলো দেওয়ালের পরে প্রতিফলিত হয়ে ওদের ছায়া ফেলেছে।

প্রশান্ত একটা চেয়ারে বসে, অদূরে মাটির পরে উবু হয়ে বসেছে শম্ভু।

পুরাতন হারান দিনের সাক্ষী!

স্মৃতির রোমন্থন চলেছে।

একা একা এতবড় প্রাসাদটা আগলে বসে আছি ভূতের মত!' শম্ভু বলছিল, মায়া কাটাতে পারিনি। যে বাড়ীতে একদিন অসংখ্য লোকজনে গম্ গম্ করতো, আজ সেখানে একটা লোক নেই। সন্ধ্যায় যখন ঘরে ঘরে আলো দেখাই, গায়ের মধ্যে ছম ছম করে।

বাবু, তোমার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তুমি যতদিন না এবাড়ীতে এসে কায়েমী হয়ে বসো, এবাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবো না। কবে তুমি আসবে সেই আশায় আশায় দিন গুনছি। তা ছাড়া পুলিশের লোকেরা যাই বলুক না কেন, আমার আজও স্থির বিশ্বাস রাজাবাবু এখনও বেঁচে আছেন।

চমকে ওঠে ও প্রশ্ন করে: কেন? একথা তুমি বলছো কেন শম্ভুদা! 'তিনি যাই করুন না কেন এবং সবাই তার সম্পর্কে যাই বলুক না কেন? আসলে তোমার বাবা সত্যিই খুব খারাপ লোক ছিলেন না।

সত্যিই কি তাই! প্রশান্ত যেন মনে মনে শম্ভুর কথায় একটা ক্ষীণ সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

ছোটবেলা থেকে ত' তাঁকে দেখে আসছি। চিরকাল তাঁর সংগে সংগে ছায়ার মতই সর্বদা ফিরতাম। সংগদোষে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। বাবুর জীবনে শনি ছিল ঐ মুখপোড়া লাহিড়ী, সতীবাবু। ওইবেটাই ছিল আসল শয়তান! না হ'লে যে বাবু তাঁর গরীব দুঃখী প্রজাদের জন্য এত করতেন, তিনি কিনা নিজের ভাইকে হত্যা করতে যান?

কিন্তু!

একটা মস্ত দোষ ছিল বাবুর আমাদের, ভাইকে বড্ড হিংসা করতেন। কেন জানি না, ভাই হলেও ছোট বাবুকে দু' চোখে দেখতে পারতেন না। হয়ত বা সৎ-ভাই বলেই।

অথচ শুনেছি কাকা নাকি বাবাকে সত্যিই ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা ভক্তিও করতেন।

তা করতেন।

তাইত' বুঝতে পারি না আজও, বাবা এ জঘন্য কাজটা করতে গেলেন কেন?

সবই অদৃষ্ট রাজাবাব। তা না হলে এমন মতিচ্ছন্নই বা

ওঁর হবে কেন বলুন? এতবড় সম্পত্তি দু' ভাইয়ের পক্ষে কেন দশটা ভাই থাকলেও অতুল ছিল।

প্রশান্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়।

আবার এক সময় শম্ভু একথা সেকথার মধ্যে বলে: আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না রাজাবাবুর মৃত্যু ঘটেছে। তিনি নিশ্চয়ই আজও বেঁচে আছেন।

কে বেঁচে আছেন শম্ভু! আচম্‌কা প্রশ্নে যুগপৎ শম্ভু ও প্রশান্ত দু'জনেই চম্‌কে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

কেউই লক্ষ্য করেনি, ইতিমধ্যে কখন এক সময় নিঃশব্দে ধূর্জটি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে।

ধূর্জটির প্রশ্নে কঠোর ভাবে শম্ভু তাঁর মুখের দিকে তাকায়।

প্রথম হতেই শম্ভু যেন ধূর্জটিকে সুনজরে দেখতে পারে নি।

ধূর্জটিরও যে শম্ভুকে খুব ভাল লেগেছে তাও হয়ত নয়। বৃদ্ধের মুখের মধ্যে এমন একটা শান্ত অথচ কঠোর নির্লিপ্ততা আছে যাকে এড়ালেও অস্বীকার করা যায় না।

পাথরের মতই কঠিন শান্ত চোখের দৃষ্টি: অন্তর পর্যন্ত যেন ভেদ করে দেখতে চায়।

অস্বাভাবিক রুগ্ন ঢ্যাংগা দড়ির মত পাকানো চেহারা: রুক্ষ!

শিরাবহুল প্যাকাটির মত সরু সরু হাড় সর্বস্ব হাত দুটো অদ্ভুত ভাবে দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটা চলা করে!

এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে সামান্য শব্দও পাওয়া যায় না হাঁটলে পরে।

ধূর্জটির আকস্মিক প্রশ্নে শম্ভু যেন হঠাৎ বোবা হ'য়ে যায়। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, দেখিগে ঠাকুর রান্নার কত দূর করলে?

শম্ভু ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ধূর্জটি সহাস্য মুখে প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে: কি কথা হচ্ছিল প্রশান্ত শম্ভুর সংগে?

সংক্ষেপে প্রশান্ত ধূর্জটিকে সব খুলে বলে, একটু আগপর্যন্ত শম্ভুর সংগে তাঁর যে সব কথাবার্তা হয়েছে।

প্রশান্তর মুখে সব কথা শুনে ধূর্জটি কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

এলোমেলো অনেকগুলো চিন্তা যেন এক সংগে এসে মাথার মধ্যে ভিড় জমায়।

মৃত রাজা বাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের খাস পেয়ারের ভৃত্য শ্রীমান শম্ভু!

দীর্ঘদিন ধরে এবাড়ীতে ও আছে।

এ বাড়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত যত নাটকীয় সংঘাত বলতে গেলে সবই তার চোখের উপর দিয়েইত ঘটেছে। এবং এখনও হয়ত অনেক অজানিত রহস্যের সন্ধান ও রাখে।

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের মৃত্যু সম্পর্কে শম্ভুও সন্দিহান, আদপে সেও ব্যাপারটা নাকি বিশ্বাস করে না, স্পষ্টই সে একটু আগে প্রশান্তর নিকট বলেছে।

কি ভাবছেন ধূর্জটি বাবু ? প্রশান্ত প্রশ্ন করে।

বিশেষ কিছু না। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি একটা সংবাদ রাখ কি ? তোমার এক দাদু হারাধন মল্লিক মশাই এখানেই থাকতেন ?

হ্যাঁ জানি, তাঁর নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সত্যি ! একেবারে বদ্ধ উন্মাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।

মামাবাবু বলেন এই রাজবাড়ী ও রাজপরিবারের পরে নাকি একটা অভিশাপ আছে, না হলে দেখুন না, কি ছিল আর কয়েক বৎসরের মধ্যে কি হয়ে গেল !

রায়পুরের রাজবাড়ীর নাম, শুনলেও লোকে ঘৃণায় আজ মুখ ফিরিয়ে নেয়। খুনী পলাতক পিতার পুত্র বলে লোকে আমার দিকে তাকিয়ে অলক্ষ্যে হাসাহাসি করে ; এ যে কত বড় দুঃসহ লজ্জা তা আপনি হয়ত বুঝতে পারবেন না ধূর্জটি বাবু ! সহপাঠি সমবয়স্কদের সংগে আমি মিশতে পর্যন্ত পারি না। বেদনায় প্রশান্তর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে।

আহা বেচারী।

পিতার পাপের গ্লানি আজ নিষ্পাপ সন্তানকে বহন করতে হচ্ছে। যে পাপের জন্য সে বিন্দুমাত্রও দোষী নয়, সেই পাপের লজ্জায় আজ সে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে।

যে পিতাকে পুত্র স্বর্গের মত গরীয়ান করে প্রণাম জানাবে, যে পিতার পরিচয় দিতে পুত্রের বুকখানি আনন্দে গর্বে ভরে উঠা উচিত, আজ তারই পরিচয় সর্বাংগে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষের জ্বালা !

এর চাইতে দুঃখের আর কি হতে পারে ?

সামান্য অর্থের লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে অপরকে বঞ্চনা করতে গিয়ে নিজেই আজ বঞ্চিত হলেন সবচাইতে বেশী !

রাজার ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও আজ যদি তিনি সত্যিই বেঁচে থাকেনও, নিঃস্ব ভিখারীর মত পথে পথে আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে হয়ত, অন্যের সুখের সম্ভাবনায় কুঠার হানতে গিয়ে নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করলেন।

নিদারুণ ভাগ্যলিপি !

—তিন— —অচেনার চিঠি—

রাত্রি বোধ করি বারটা হবে।

গভীর থম্ থমে গ্রীষ্ম রাত্রি! সেই সংগে অসহ্য গুমোট গরম। বাতাসের লেশমাত্র নেই।

পাশেই খাটের পরে প্রশান্ত গভীর নিদ্রাভিভূত !

ধূর্জটির চোখে কিন্তু-ঘুম নেই !

হস্তধৃত অৰ্দ্ধপঠিত বইখানা পাশের ত্রিপয়ের 'পরে নামিয়ে রেখে ধূর্জটি উঠে দাঁড়াল। খোলা বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়াল। অস্পষ্ট আলো আঁধারে নীচের প্রশস্ত আংগিনাটা চোখে পড়ে।

কোথাও সামান্য সাড়া শব্দটি পর্যন্ত নেই, নিঃশব্দ নিঝঝুম চারিধার।

হঠাৎ ধূর্জটির দৃষ্টিটা যেন চকিতে প্রখর হ'য়ে ওঠে; অস্পষ্ট আলো আঁধারে নীচের আংগিনা অতিক্রম করে শ্বেত বসন পরিধানে এক দীর্ঘ ছায়া মূর্ত্তি যেন দ্রুত পায়ে চলেছে অন্দর মহলের দিকে।

অত্যন্ত দ্রুত যেন মূর্তি মিলিয়ে গেল দৃষ্টি পথ হতে; চোখের ভ্রম নয়ত! নিশ্চয়ই না।

কেন চোখের ভ্রম হবে?

সম্পূর্ণ জাগরিত অবস্থা: এবং স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে ধূর্জটি! নিজের চোখের দৃষ্টিকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না।

অপসৃত ছায়ামূর্তির চলার ভংগিটা দ্রুত হলেও ধূর্জটির অপরিচিত নয়; চলার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, যেটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

ধূর্জটি নিঃশব্দে কক্ষ হ'তে নিক্রান্ত হ'য়ে গেল!

* * *

ধূর্জটির কক্ষ ত্যাগের অল্প কিছুক্ষণ পরে।

প্রশান্ত তেমনি অঘোরে ঘুমিয়ে শয্যার পরে। কক্ষের ওপাশের ভেজান দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল: উন্মুক্ত দরজা পথে প্রথমে দেখা গেল একটি মুখ।

গালভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি, মাথার চুল রুক্ষ এলো মেলো।

চোখত নয় যেন অন্ধকারে দু'খণ্ড অংগারের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে।

তাকাতেও ভয় হয়।

নিঃশব্দে আগন্তুক হাত দিয়ে কবাট ছু'টো ঠেলে আরো ফাঁক করে দেয়ঃ শীর্ণ বাহু! হাতের প্রতিটি শিরা পাকান দড়ির মত সজাগ হয়ে উঠেছে চামড়া ঠেলে।

আগন্তুক এবারে কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল; পরিধানে লম্বা কালো প্যান্ট, পায়ে একটা কালো কোট। পায়ে ক্রেপ্ সোলের কালো জুতো।

আগন্তুক আরো এগিয়ে এসে একেবারে প্রশান্তর শিয়রের সামনে এসে দাঁড়ায়।

নির্বাক পলকহারা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শয্যাশায়ী ঘুমন্ত প্রশান্তর মুখের দিকে।

দৃষ্টি দিয়ে যেন প্রশান্তর সর্বাগ লেহন করে নিচ্ছে আগন্তুক।

ধীরে ধীরে একসময় শিরাবহুল ছু'টি হাত প্রশান্তর মুখের দিকে বাড়িয়ে দেয় এবং ক্রমে স্পর্শ করে প্রশান্তর মুখ।

আচমকা প্রশান্তর ঘুমটা ভেংগে যায়। নিদ্রালু দৃষ্টিতে প্রশান্ত তাকায়ঃ সংগে সংগে না জানি কি এক ছুর্নিবার অজানিত আশংকায় ওর সর্বদেহ বারেকের জন্য শিউরে ওঠেঃ একটা অস্ফুট চিৎকার কণ্ঠ ঠেলে বের হয়ে আসেঃ কে! কে?

বিছ্যৎ গতিতে আগন্তুক এক লাফে খোলা দরজাপথে অদৃশ্য হয়ে যাবার সংগে সংগেই দরজার কপাট ছু'টো বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশান্ত ততক্ষণে শয্যার পরে উঠে বসেছে : ভীত বিস্মিত দৃষ্টি প্রসারিত করে ও ঘরের চারিপাশে তাকাতে থাকে।

ধূর্জটি এসে ঘরে প্রবেশ করল: কি! কি হয়েছে প্রশান্ত ?

ধূর্জটির কণ্ঠে উদ্বেগ ও আকুলতা।

প্রশান্ত বোকার মত ধূর্জটির দিকে তাকায়।

কি হয়েছে, চিৎকার করে উঠেছিলে কেন একটু আগে ?

আমি বোধ হয় একটা স্বপ্ন দেখছিলাম ধূর্জটি বাবু, প্রশান্ত বলে।

স্বপ্ন দেখছিলে ! কি স্বপ্ন !

প্রশান্ত একটু আগের ঘটনাটা আনুপূর্বিক ধূর্জটিকে বলে।

ধূর্জটি উঠে গিয়ে বন্ধ দরজাটা ঠেলে দেখলে, না দরজাটা ওদিক থেকে বন্ধ !

রাজবাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং করে রাত্রি একটা ঘোষণা করলে।

কোথায় কোন বৃক্ষন্তরাল হ'তে একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে।

রাত্রি অনেক হলো, তুমি শুয়ে পড় প্রশান্ত। কাল সকালে এবিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

প্রশান্ত শয্যার পরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু চোখে ঘুম আসে না: ক্ষণিকের দেখা সেই দাড়ি গোঁফ-ওয়ালা বিভৎস মুখখানা। ক্ষুধিত আগুনের মত সেই ক্ষণিকের দেখা দৃষ্টি যেন কেবলই মুদ্রিত আঁখির পটে বার বার ভেসে ভেসে ওঠে।

স্বপ্ন নয় সত্যি !...

ভয় পাওয়ার ছেলে প্রশান্ত নয়। ভয় সে আদৌ পায় নি।

আজগুবী ভৌতিক কাহিনীতে তার কোনদিনই সামান্য আস্থাও নেই। অবিশ্বাস্য গল্প কথা মানুষের অসম্ভব কল্পনা মাত্র

কেউ তার শয্যার একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়ে ছিল অবধারিত সত্যি। কিন্তু কে সে? কেনই বা সে এত রাত্রে চোরের মত তার ঘরে প্রবেশ করে তার শয্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল!

কি উদ্দেশ্য ছিল তার!

বাকী রাতটুকু চোখের পাতায় আর ঘুম এলো না প্রশান্তর।

উৎক্ষিপ্ত চিন্তায় সবটা যেন বিভ্রান্ত!

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফুঁটে ওঠে নি: ধূর্জটি ডাকল: চল প্রশান্ত বেড়িয়ে আসি নদীর ধারে।

ভোরের আলো নামছে পৃথিবীর বুকে একটু একটু করে।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল আজকের মত, এ তারই রূঢ় ইংগিত: সারাটা রাত্রির অসহ্য গুমোটের পর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়াটা যেন বড় ভাল লাগে।

সহরবাসীর নিদ্রা এখনও ভাংগেনি: কচিৎ দু' একজন প্রভাত বায়ু সেবীর দেখা মিলছে। নির্জন নদীতটে তারা যখন এসে দাঁড়াল: আচম্‌কা ওরা চম্‌কে ওঠে একটা উচ্চহাসির

হাঃ হাঃ করে কে যেন প্রচণ্ড হাসির বেগে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

দু'জনে হাসির শব্দ লক্ষ্য করে আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখলে, নদীতটে একেবারে জলের কিনারে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত একটা লোক, নীচু হ'য়ে দু'হাতে অঞ্জলি ভরে মাঝে মাঝে নদী থেকে জল তুলে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করছে, আর আপন মনে বলছে ঃ ফুঃ!...ফুঃ!...যা! তোর আত্মার শান্তি হোক!...জগো শালার আত্মার শান্তি হোক।

পরক্ষণেই আবার হাঃ হাঃ করে প্রচণ্ড বেগে হেসে উঠ্‌ছে।

পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন ঃ মাথা ভর্তি জট পাকানো রুক্ষ কাঁচা পাঁকা চুল। ন্যুব্জ দেহ!...শীর্ণ কংকালসার।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

ধূর্জটি আর প্রশান্ত আরো এগিয়ে আসে একেবারে নদীর জলের ধার পর্যন্ত।

ওদের পায়ের শব্দে লোকটা ফিরে তাকায় ঃ কে?

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে, যেন দৃষ্টির আগুনে ওদের পুড়িয়ে একেবারে ভষ্ম করে দেবে।

প্রশান্ত অজান্তেই কেমন যেন আচম্‌কা দু' পা পিছিয়ে আসে।

ভয় পেয়েছিস্? কেন রে?

ধূর্জটি তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে লোকটার আপাদ মস্তক পরীক্ষা করছিল।

লোকটাও তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূর্জটির দিকে নির্বাক পলকহীন।

দীর্ঘ আট বৎসরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে হারাধন মল্লিকের, বয়সের ভারে দেহ যেন নুয়ে পড়েছে। বহু দিন ক্ষৌরকর্মের অভাবে, মুখভর্তি গোঁফ দাড়ি, দীর্ঘ জট পাকানো রুক্ষ্ম কেশ, কোটরাগত চক্ষু, লোলচর্ম।

দেখছো কি! আমাকে চিনতে পারছো নাত, পারবেও না। দেখেই রাজা রত্নেশ্বর মল্লিকের পুত্র হারাধন মল্লিককে চিনতে পারবে সেদিন আর নেই। সেদিন চলে গেছে!

প্রশান্ত, তোমার দাদু!···

দাদু!...হাঁ!...

প্রশান্ত এগিয়ে যায়, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণেই বোধকরি উন্মাদ হারাধনের দিকে এক পা দু'পা করে।

ওরে ছুঁস্‌নে! ছুঁস্‌নে!···সরে যা! আমার দেহে বিষ আছে! জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবি। আর্তচিৎকার করে ওঠে হারাধন।

সভয়ে প্রশান্ত পিছিয়ে আসে।

আমি যাই! আমি যাই ঃ ত্রস্তপদে যেন ভীত সশংকিত ভাবে হারাধন পিছু হঁটে, ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ছুটতে সুরু করে।

দেখতে দেখতে হারাধন নদীর পাড় ধরে ছুট্‌তে ছুট্‌তে অদৃশ্য হ য়ে যায়।

প্রশান্তর চোখে কেন না জানি জল এসে গিয়েছিল! রক্তে জাগে অদৃশ্য মায়ার দোলা।

প্রশান্ত তাকিয়ে ছিল হারাধনেরই গমন পথের দিকে, কেমন অন্যমনা হয়ে।

ধূর্জটির ডাকে আবার বুঝি সম্বিৎ ফিরে আসে : প্রশান্ত!

এ্যাঁ, আমাকে ডাকছিলেন?

হ্যাঁ, চল এবারে ফেরা যাক।

* * *

প্রাসাদে ফিরে এসে ওরা দেখলে কাছারী বাড়ীর সামনে বহু সাঁওতাল প্রজা জমায়েৎ হয়েছে।

ঘরের মধ্যে মিঃ হুড্ ও একজন কর্মচারী কি সব কথাবার্তা বলছে।

প্রশান্তকে দেখে সাঁওতালরা হল্লা করে ওঠে : হামার রাজা আসিয়াছে, প্রণামরে রাজা প্রণাম। তুর এতোদিন বাদে হামাদেরকে মনে পড়লো রে রাজা!...সর্দার কলস্বরে অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসে।

প্রশান্ত এতগুলো লোকের সাদর অভ্যর্থনায় কেমন যেন লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করে।

মিঃ হুড্ ঘর হ'তে বের হয়ে এলেন, প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন : তোমার সাঁওতাল প্রজারা তোমাকে সেলাম দিতে এসেছে। Young king, take their salute!

প্রজারা যে যার সাধ্যমত টাকা পয়সা আধুলি দুয়ানী দিয়ে প্রশান্তর নজরানা দিতে লাগল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় প্রশান্ত ওদের হাত হ'তে মুক্তি পেয়ে অন্দরে গেল।

ধূর্জটি বাইরে মিঃ হুডের ঘরে বসে তাঁর সংগে আলাপ করতে লাগল।

* * *

ঘরের মধ্যে যে কতবড় আর একটা বিস্ময় প্রশান্তর জন্য অপেক্ষা করছিল তা তার জানা ছিল না; অহৈতুক একটা আনন্দ হিল্লোলে প্রাণ যেন ভরে গিয়েছিল।

লঘুপদে সানন্দ চিত্তে শিষ্‌ দিতে দিতে প্রশান্ত শয়ন কক্ষে এসে প্রবেশ করে।

আজিকার সকালে আচম্‌কা নদীর ধারে হারাধনের সংগে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে যে দুঃখ সে বহন করে এনেছিল, দুঃখময় অতীত স্মৃতির বেদনায় অন্তরে যে বিক্ষোভ জাগিয়েছিল, এখন যেন তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

প্রশান্ত সটান্‌ এসে শয্যাটার পরে গা এলিয়ে দেয়।

খোলা জানালা পথে ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চোখে মুখে যেন একটা স্নিগ্ধ ঝাপ্‌টা দিয়ে যায়।

জাগরণক্লান্ত আঁখি দু'টি যেন মুদে আসে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বালিশের তলায় হাত যেতেই কাগজের মত ভাঁজ করা কি যেন একটা হাতে ঠেকে।

কৌতূহল ভরে বালিশটা উল্টে দেখতে পায় একটা ভাঁজ করা কাগজ।

কাগজটা ময়লা।

আশ্চর্য। কিসের কাগজ! কৌতূহলী প্রশান্ত কাগজের ভাঁজটা খুলে ফেলে।

একটা চিঠি। উপরে স্পষ্টাক্ষরে লেখা: লুকিয়ে গোপনে পড়ে ছিঁড়ে ফেল। কল্যানীয়েষু প্রশান্ত।

পরম আগ্রহে কৌতূহলে প্রশান্ত চিঠিটার পরে ঝুঁকে পড়ে একাগ্র দৃষ্টি ও অখণ্ড মনোযোগে।

কল্যানীয়েষু, প্রশান্ত!

তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি এবং বহুকাল হতেই চিনি। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ আমাকে বাধ্য হয়েই তোমার কাছেও আত্ম পরিচয়টুকু গোপন রাখতে হচ্ছে। এ যে কতবড় দুঃসহ দুঃখ তা একমাত্র আমিই জানি, আর জানেন আমার অন্তর্যামী ভগবান। আমি যে কে সে পরিচয় জানবার চেষ্টা করো না। কারণ চেষ্টা করলেও সফল হবে না। তবে এইটুকু জেনো, সত্যিই তোমার আমি একজন হিতাকাংখী! তোমার মংগলই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র কামনা। অভিশপ্ত রায়পুর রাজ-বংশের একমাত্র বংশকুল-প্রদীপ তুমি! তুমি যে এত তাড়াতাড়ি রায়পুরে আসবে এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। যাহোক, এসেছো যখন বুঝবো এটা বিধাতারই অভিপ্রেত! আজ কোথায় তোমার আবাহনে রায়পুরের প্রাসাদ মংগল শংখধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠবে, তার বদলে

অন্ধকার আলোকহীন পুরীতে তোমাকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে! এ দৃশ্যও আমায় দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে হলো।

* * একটা কথা তোমাকে না বললে তোমার মনেও হয়ত খট্‌কা লাগতে পারে, তাই বলছি, তোমার পিতা সুবিনয় মল্লিকের আমি একজন অন্তরংগ বন্ধু! এবং আশৈশবের বন্ধু! আজ হয়ত তোমার অজানা নেই, রায়পুর রাজবংশের অভিশপ্ত কাহিনীর কথা।

তুমি জান তোমার পিতা খুনের দায়ে পলাতক হয়েছিলেন, এবং কিছুকাল পরে পলাতক ও আত্মগোপন অবস্থাতেই পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এতবড় মিথ্যা আর হ'তে পারে না। আমি কেন জানি না একেবারে স্থির নিশ্চিত, তিনি এখনো জীবিতই আছেন। হাঁ, জীবিতই আছেন!

তুমিই তাঁর একমাত্র সন্তান, তাঁর বাকী শেষ জীবনের ও শেষ সান্ত্বনা। অন্যায় যা কিছু তিনি করেছেন সবই হয়ত তোমারই জন্য। অবিশ্যি তুমি হয়ত বলতে পারো, তোমার একার জীবন স্বচ্ছল ও আনন্দেই কাটত তবে তিনি কেন এ অন্যায় করতে গেলেন। একথা সত্য এবং অনস্বীকার্য যে, যে অপরাধে তিনি অপরাধী ও অভিযুক্ত সে অপরাধের কোন ক্ষমাই নেই। ভাই হয়ে তিনি ভাইকে হত্যার প্রচেষ্টা করেছেন ও হত্যাকারী না হলেও স্বয়ং ভাইয়ের হত্যার ব্যাপারে মূলতঃ প্রধান অংশই নিয়েছেন।

তোমার কাকা সুহাস মল্লিকের হত্যার পর তার সংগে

আমার দেখা হয়েছিল, তিনি তখন অকপটে সব কথাই আমার কাছে স্বীকার করেছেন, যাকে হত্যা করবার জন্য তিনি কিশোর কাল হতেই বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন, পরিণত বয়সে তাকে হত্যা করবার পরও তাঁর মনে যদিচ কোন অনুশোচনা জাগে নি, পরে কিন্তু আসে সেই অনুশোচনা তোমার কথা ভেবে। দূর হ'তে পলাতক অবস্থায় তোমাকে দেখে অনুশোচনার বেদনায় তিনি দগ্ধ হ'য়েছেন। আজ তিনি লোকের চোখে খুনী হলেও, তাঁর এই মতিগতির জন্য হয়ত নিজে তিনি ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী তাঁকে যারা মানুষ করেছিলেন একদা।

স্নেহই তিনি পেয়েছেন শুধু, কিন্তু চারিত্রিক গঠনে তাঁর সহয়তা কেউই করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

একটি মাতৃহারা কিশোর বালক ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে বেড়ে উঠেছে ঃ খাম খেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতা যাকে অন্ধ করে রেখেছে, পরবর্তী জীবনে যদি সে এমনি করে আত্মপ্রকাশ করে, তার জন্য দায়ী কি একা তিনি নিজেই সবটা ?

আজ তোমার বয়স অল্প, সব ভাল ও স্পষ্ট করে বুঝতে পারবে না ; কিন্তু একদিন হয়ত তোমার হতভাগ্য পলাতক খুনী পিতার সত্যিকারের মর্ম্ম-ব্যথার বোধটা অনুভব করতে পারবে এবং আজ না হলেও অন্তত সেদিন তোমার হতভাগ্য পিতাকে স্মরণ করে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে ত ?

আজ তোমার চোখে তিনি যতবড় অপরাধীই হন না কেন,

সেদিন যেন তাঁর অপরাধের বিচার করে তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখো না, তোমার স্নেহ ও ভালবাসা হ'তে।

যাক্, আজকের মত এখানেই চিঠি শেষ করি: আশীর্বাদ জেনো।

আঃ চির শুভার্থী
তোমার কশ্চিৎ পিতৃ-বন্ধু

—চার— —রাতের অন্ধকারে—

চিঠিটা প্রশান্ত একবার দু'বার আগাগোড়া খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লে।

একি বিস্ময়!

যে পিতাকে সে মৃত বলেই জানে, তাঁর সম্পর্কে একি অভাবিত সংবাদ। শুধু সংবাদই নয় দুঃসংবাদ।

যে অসহ গ্লানি ও বেদনার স্মৃতি নিয়ে তার পলাতক খুনী পিতার কথা তার কিশোর মনের সবটুকুই প্রায় জুড়ে আছে, যে দুঃসহ স্মৃতি তাকে দুঃস্বপ্নের মতই তার পিছু পিছু সর্বদা তাড়না করে ফেরে আজও, যাকে সে মনে প্রাণে সত্যিই ভুলতে চেয়েছে, তার সম্পর্কে একি আকস্মিক রহস্য উদ্‌ঘাটন!

পাঠ্য বইতে ও পড়েছে: পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ। তার পিতা যাই হোন না কেন, যাই তাঁর সত্যিকারের পরিচয় হোক না কেন, পুত্র হয়ে সেত তার সমালোচনার অধিকারী নয়।

সমালোচনা সে করেও নিঃ সব জেনেও পিতার সকল স্মৃতিকেই জ্ঞান হওয়া অবধি সে এড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, সে এড়াতে চাইলেও তার পারিপার্শ্বিক জগৎ যেন তাকে কোন দিনই তার খুনী পলাতক পিতার কথা ভুলতে দেয় নি। সাক্ষাতে ইংগিতে স্পষ্ট করে না হলেও অস্পষ্ট ভাবে সবাই তার দিকে আংগুল তুলে যেন বলছে ঃ খুনে পলাতক আসামীর ছেলে, ভাই হয়ে যে ভাইকে সম্পত্তির লোভে খুন করেছে।

রায়পুরের প্রতি একটা কঠোর বিতৃষ্ণা হয়ত সেই জন্যই তার মনকে ক্রমে ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলেছে।

সে নিজেকেও নিজে যেন কোন দিনই ক্ষমা করতে পারেনি।

দুঃখের ভারে সে নুয়ে পড়েছে, লজ্জায় গ্লানিতে সর্বাংগ তার কালি হ'য়ে গেছে।

দশজনের সংগ হ'তে ভয়ে সে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছে।

কিন্তু তবু ঃ মনে পড়ে আজও সেই আবছা-স্মৃতি !

খুব সামান্য পরিচয়ই হবার তার সুযোগ হয়েছিল পিতার সংগে।

ছোট বেলা হতেই সে মামার বাড়ীতে মানুষ। মাকে ত মনেই পড়ে না। মধ্যে মধ্যে পিতা ক'লকাতায় এলে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন।

গম্ভীর প্রকৃতির সুবিনয়কে দেখে প্রশান্ত কোন দিনই তাঁর

কাছে ঘেঁষবার মত মনে সাহস পায়নি, সুবিনয়ও ছেলের সংগে খুব কম কথাই বলতেন।

পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে সহজ স্নেহের সম্পর্ক, তা কোন দিনই গড়ে উঠবার অবকাশ পায়নি।

ভীতি, শ্রদ্ধা ও সংকোচে বহুদিন পর্যন্ত পিতা তার কাছে অস্পষ্ট হয়েই ছিলেন ঃ তারপর অকস্মাৎ এলো সেই দুর্দিন ঃ একটা যেন দুর্মদ ঝড় বহে গেল রায়পুরের রাজবাটীর উপর দিয়ে, শেষ চিঠির মধ্য দিয়েই নাকি তিনি স্বীকৃত দিয়ে গেছেন, কাকা সুহাসের মৃত্যু তিনি ঘটিয়েছেন চক্রান্ত করে, তার পর সতীনাথ লাহিড়ী ও দাদু নিশানাথকে তিনি নিজেই হত্যা করেছেন। তবে তিনি হত্যাকারী নন কেমন করে?

বালকের মন নিজের অজ্ঞাতেই সেদিন পিতার 'পরে বিরূপ হয়ে উঠেছিল এবং ক্রমে সেটা রূপান্তরিত হয় একটা আতংক মিশ্রিত ঘৃণায়।

মনে মনে সে সত্যিই পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল ঃ কিন্তু আজকের এই পত্রখানা যেন তার মনের সমস্ত নিশ্চিন্ততার মূল ধরে প্রবল একটা নাড়া দিয়ে গেল।

প্রশান্ত চিঠিখানা ভাঁজ করে সযতনে পকেটে রেখে দিল।

মনটা যেন সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে ঃ সকাল বেলা নদীর ধারে অতর্কিতে বিকৃত মস্তিষ্ক হারাধনকে দেখা অবধি মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ ও ব্যথাতুর হ'য়ে ছিল, তারপর বাড়ীতে এসে এই পত্রখানা।

ধূর্জটি এসে ঘরে প্রবেশ করে : প্রাশান্ত বাবুর কি হচ্ছে ? অমন মুখ ভার করে বসে যে !

কে, মিঃ রায় ? আসুন ! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

নীচে তোমাদের সাঁওতাল প্রজা মুন্না সর্দারের সংগে আলাপ করছিলাম। লোকটা বেশ চমৎকার, আজ ওদের সাঁওতাল পল্লীতে কি একটা উৎসব আছে, দেখতে যেতে বলে গেল। সাঁওতালদের উৎসব কখনো দেখেছো ?

না।

চল, যাবে আজ রাত্রে ?

বেশত যাওয়া যাবে।

প্রখর বুদ্ধিশালী ধূর্জটির পক্ষে বুঝতে কষ্ট হয় না, যে-কোন কারণেই হোক প্রশান্তর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে প্রশান্তকে সে আর দ্বিতীয় প্রশ্নমাত্র করলো না। প্রশান্ত নিজে থেকে যখন কোন কথা বলতে ইচ্ছুক নয়, তখন এবিষয়ে তাকে পীড়াপিড়ী করা ধূর্জটির স্বভাববিরুদ্ধ।

আহারাদির পর রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় ধূর্জটি ও প্রশান্ত একজন বরকন্দাজকে সংগে নিয়ে সাঁওতাল পল্লীর দিকে রওনা হলো।

চাঁদ উঠতে এখনো দেরী আছে।

ছোট্ট সহর এর মধ্যেই নির্জন হয়ে পড়েছে।

নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অনেকটা হেঁটে গেলে তবে সাঁওতাল পল্লীতে পৌছান যায়।

আবছা অন্ধকারে নদীর জলরেখা অস্পষ্ট একটা ধূসর রেখার মত মনে হয়।

কোথাও এতটুকু বাতাসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

নদীর ধারে ধারে বন বাব্‌লা ও কাঁটামনসার ঝোপ ঃ তারই কোল ঘেঁষে একেবারে নদীর বালিয়ারী নেমে গেছে ঃ দূরবর্তী গাঁয়ের লোকেরাই এ পথটা চলাচলের জন্য ব্যবহার করে।

মাথার 'পরে কালো আকাশের গায়ে তারা গুলো পিট্‌ পিট্‌ করে জ্বলে ঃ যেন এই নীচের অস্পষ্ট অন্ধকার নিঃসাড় পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে!

ধূর্জটি বা প্রশান্ত কেউই লক্ষ্য করেনি, ওরা যখন প্রাসাদ হ'তে বের হয়ে আসে, একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করেছে।

অন্ধকারে মূর্তিটাকে ভাল করে বোঝা যায় না ঃ পরিধানে কালো সার্জের একটা প্যাণ্ট্‌। পায়ে ভারী রাবার-সোলের জুতো ঃ চললে এতটুকু শব্দও হয় না।

মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। কপালে একটা কালো রেশমী রুমাল বাঁধা মাথার পশ্চাৎ ভাগে গিঁট দিয়ে।

বেশ খানিকটা তফাৎ রেখেই ছায়ামূর্তি ওদের দু'জনকে অনুসরণ করে চলেছে।

আরো কিছু দূর অগ্রসর হতেই দূর হতে ভেসে আসে মাদলের অস্পষ্ট ডুম্‌ ডুম্‌ শব্দ ও একটা সম্মিলিত বহু কণ্ঠের অস্পষ্ট সংগীতধ্বনি। সাঁওতালী সুর।

মাদলের শব্দের সংগে বাঁশীতে প্রাণ উদাস করা মিঠে সাঁওতালী সুর।

নিঃস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রির আঁধার সমুদ্র সাঁতরে আসছে যেন বহুদূর হ'তে ভেসে সেই সরল বন্য প্রাণের উচ্ছল আবেগময় সংগীত।

ধূর্জটি স্থান কাল পাত্র ভুলে যায় ক্ষণেকের জন্য : সুরের টানে টানে মন ভেসে যায় কোন সুদূরে কে জানে।

সহরের একেবারে শেষপ্রান্ত : নদীর কোল ঘেঁষে ঘন গাছ পালা স্থানটিকে ছায়া সুনিবিড় করে রেখেছে : ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলো, বিন্নি ঘাসের ছাওয়া ঘরের চাল ; তক্‌তকে মাটির নিকানো আংগিনা, বড় বড় কয়েকটা তেলের কুপী জ্বলছে দপ্‌ দপ্‌ করে, অন্ধকারে দৈত্যের জ্বলন্ত চোখের মত। তার আশপাশে যত মেয়ে পুরুষরাঘিরে বসেছে, কয়েকজন মাদল বাজাচ্ছে : মেয়েরা খোঁপায় গুঁজেছে বুনো ফুলের গুচ্ছ।

কালো কষ্টি-পাথরের মত দেহ : যেমন মসৃণ তেমনি কোমল : মশালের লাল আলো যেন গায়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে।

মাদলের সংগে বাজছে বাঁশের বাঁশরী।

কয়েকটি সাঁওতালী অল্প বয়েসী মেয়ে পরস্পরের কাঁধে ও কোমরে হাত জড়িয়ে মাদলের তালে তালে নাচছে : ভরা পূর্ণিমার বুকে যেন জোয়ারের কালোচ্ছ্বাস।

ওরা ওখানে প্রবেশ করতেই মন্নু সর্দার কলস্বরে চিৎকার করে ওঠে : ওরে হামাদের রাজা বাবু এলোরে। রাজা বাবু এলো। বাজা মাদল। বাজা বাঁশী। নাচরে তোরা নাচ।

সর্দারের আনন্দ-ঘন আহ্বানে সকলেই সোল্লাসে সজাগ হয়ে উঠে যেন।

ডুম্…ডুমা…ডুম্… !…মাদলের শব্দ, বাঁশীর সুর।

একজন ইতিমধ্যে গিয়ে দু'টো বেতের মোড়া নিয়ে এসে একটু তফাতে পেতে দেয়: বোস্ রাজা, বোস ইখানটায়।

প্রশান্তর কচিবুকখানা যেন অদ্ভুত একটা আনন্দ শিহরণে শির শির করে ওঠে।

উৎসব আনন্দে ধূর্জটি ও প্রশান্ত ডুবে যায়।

* * * *

বুনো ঘাসে এ জায়গাটা আকীর্ণ।

মাঝে মাঝে তার মধ্যে লজ্জাবতীলতা ও ভাংগ গাছের ক্রমবর্দ্ধমান শাখা প্রশাখায় পা ফেলবারও জায়গা নেই।

এত নিবিড় আগাছা, যে সাপের অবাধ গতিবিধি সেখানে প্রায়ই: তারই মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সেই ছায়াটা, একটু আগে প্রশান্ত ও ধূর্জটিকে যে অনুসরণ করছিল।

এখানেও মাদল বাঁশী ও গানের সুর ভেসে আসছে স্পষ্টই।

ছায়ারও কি ছায়া পড়লো পিছনে!

হাঁ, আরো একটা ছায়া নিঃশব্দে আগের ছায়ার পশ্চাতে এসে দাঁড়ায়, এবং নিঃশব্দেই লক্ষ্য করতে থাকে সামনের ছায়াটাকে।

হঠাৎ পশ্চাতের ছায়া যেন শব্দে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে:

খিল্ খিল্ করে একটা চাপা হাসির ঢেউ আশ পাশের অন্ধকার ও জংগলে ভাংগা ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ে।

কে ? চকিতে সামনের ছায়া ফিরে তাকায় : কে ?

ভয় নেইরে। ভয় নেই তোর। তুইও পাগল কিনা দেখতে এলাম।

কে তুই।

আমি ! আমি! তাত' কই জানি না! কে আমি বলত ?

হারাধন মল্লিক না !

চুপ্। আস্তে। ও নাম করিস্ না, লোকে শুনতে পাবে। হারাধন মল্লিক কি আর আছে, কবে কোন কালে মরে গেছে। মরে ভূত হ'য়ে গেছে। হাঁ সে মরে ভূত হয়ে গেছে।

এখানে কি করছিস্ ?

তোকে দেখতে এলাম।

আমাকে দেখতে ?

হাঁ, দেখবো না ! চোরের মত বন জংগলে অমন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিস্, তোদের দেখ্লেই সন্দেহ হয়। সেও অমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত, প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। আর বুঝবোই বা কি করে, ওর মাথায় যে অমন করে পোকায় বাসা বেঁধেছে, তাকি ছাই আগে জানতে পেরেছি : জগাটা যে এমনি করে শেষ-পর্যন্ত ফাঁকি দেবে তাকি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছি!...তারপর একটু থেমে

আবার বলে : অন্ধকারে এমনি করে ঘুরিস নে, বাড়ী ফিরে যা।

দ্বিতীয় ছায়া চলে গেল।

প্রথম ছায়া দাঁড়িয়েই রইলো।

## —পাঁচ— —ঘটনার স্রোতে—

প্রশান্তর ডাইরী থেকে :

সে রাত্রেও হঠাৎ ঘুমটা ভেংগে গেল, কেমন একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দে : অন্ধকারে কে যেন ফুলে ফুলে কেবলই কাঁদছে।

চোখ খুলে অন্ধকারে ঘরের চারিপাশে তাকালাম। চোখের পাতা থেকে ঘুমের আমেজটা তখনও মুছে যায়নি।

ঘরের আলোটা কখন এক সময় নিভে গেছে : নিশ্চিদ্র আঁধারে সমস্ত ঘরটা যেন জমাট বেঁধে উঠেছে। ওপাশের খাটে ধূর্জটিবাবু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে যেন একটা অনুচ্চারিত বুক ভাংগা বেদনা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছে।

ঘরের চারিপাশে ভাল করে তাকালাম : কই কিছুইত' দেখা যায় না।

কেউ ত' নেই ঘরের মধ্যে!

শুধু পরের রাত্রেই নয়, পর পর প্রায় প্রতি রাত্রেই মনে হয়েছে নিঃশব্দে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে যেন কে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাসের বেদনায় ঘরের সমস্ত বাতাস জমাট বেঁধে ওঠে, অথচ কাউকে দেখতে পাই না।

ঘুমের ঘোরে মনে হয়েছে, কে যেন নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে আমার শয্যার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেঃ নীরবে আমার মাথার চুলে হাত বুলাচ্ছে।

কখনও হয়ত কপালের পরে তপ্ত-অশ্রুর ফোঁটা এসে পড়তেই ঘুম গেছে ভেংগে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

একটা অস্বোয়াস্তিতে মনটা যেন কেমন কেমন করে উঠেছে।

সর্বাংগে অনুভব করেছি একটা স্নেহাতুর কোমল স্পর্শঃ বুকের ভিতরে হা হা করে উঠেছে।

কে আসে এমনি করে প্রতি রাত্রে আমার শয়নকক্ষে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, রাত্রির গভীর অন্ধকারে।

ঘুমের মধ্যে কার স্নুকোমল স্নেহপরশ অনুভব করি সর্বাংগে আমার।

ধূর্জটিবাবুকে বলবো কি সব কথা খুলে!

তিনি হয়ত বিশ্বাসই করবেন না, হেসে সব কথা উড়িয়ে দেবেন। বলবেনঃ স্বপ্ন দেখেছি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি।

কিন্তু সত্যিই কি স্বপ্ন!

কিছুই কি এর মধ্যে সত্য নেই! কেবল কল্পনাই!

মন কিন্তু সে কথা মেনে নিতে চায় না।

## —ছয়—



সহরের এক প্রান্তে একটা দ্বিতল পুরাতন অট্টালিকা: অনেক দিন বাড়ীটায় কোন জনমানব বসবাস করে না।

ঐ বাড়ীরই দোতালার একটা ঘরে, একটা উবুড়-করা খালি সিগ্রেটের টিনের উপরে একটা ক্ষয়প্রাপ্ত এক পয়সা দামের সরু মোমবাতি টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে।

ধূলিমলিন মেঝের 'পরে একটা শতছিন্ন মাতুর পেতে একটা লোক নাক ডাকাচ্ছে: লোকটা মধ্যবয়েসী হবে। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।

গায়ের রং আবলুষের মত কালো: গাট্টা গোট্টা গড়ন। লোকটা গায়ে যে বেশ শক্তি ধরে দেখ্‌লেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

নাকটা ভোঁতা: পুরু ওষ্ঠ; অত্যধিক ধূমপানে একেবারে কালো হয়ে গেছে: সামনের তু'টো দাঁত উপরের ওষ্ঠকে ঠেলে সামনের দিকে বিকশিত হ'য়ে আছে। কপালের 'পরে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

নোংড়া অপরিচ্ছন্ন একটা ধুতি পরিধানে, গায়ে একটা ততোধিক মলিন হাফসার্ট।

নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির মত বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক এসে ঘরের একটি মাত্র ভেজান দ্বার ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল: মাথায় একটা কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো টুপি। এক জোড়া মোটা পাকান গোঁফ।

শক্ত চৌকো চোয়াল। শিকারী বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি।

পরিধানে লং প্যান্ট্ ও হাফসার্ট।

ঘরের এককোণে একটা কেরোসিন কাঠের খালি বাক্স উবুড় করা, তার উপরে একটা পুরাতন ময়লা সংবাদপত্র বিছান।

আগন্তুক এসে কাঠের বাক্সটার 'পরে বসে ঃ পকেট হ'তে একটা পাইপ্ ও টোব্যাকো পাউচ্ বের ক'রে, খানিকটা টোব্যাকো পাইপে ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল।

বেশ আয়েস করে পাইপে গোটা কয়েক টান দিয়ে একগাল পীতাভ ধোঁয়া উদ্গীরণ করে শায়িত ঘুমন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চস্বরে ডাকল ঃ হ্যাপা! এই হ্যাপা! ওঠ্... কত ঘুমোবি ?...

আগন্তুকের ডাকে ঘুমন্ত লোকটা চোখ রগড়াতে রগড়াতে মাদুরের 'পরে উঠে বসে ঃ এঁ্যা!

তুই কি কেবল এমনি করে পড়ে পড়ে ঘুমোতেই এখানে এসেছিস ?

একটা বিরাট হাই তুলতে তুলতে দু'হাত মাথার উপর প্রসারিত করে ঘুমজড়ান স্বরে লোকটা জবাব দেয় ঃ বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

কেন, কাল যে খাবার আনা হয়েছিল সব সাব্ড়ে দিয়েছিস্ নাকি এর মধ্যে ?

এক হাঁড়ি রসগোল্লা আর কিছু নোন্তা ভাজা ত'! ওতে কি মানুষের ক্ষিদে মেটে?

তা বটে !

একটা কালো রংয়ের রোমশ কুকুর ঘরের মধ্যে ঢুকে জিহ্বা বের করে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁপাতে থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পা ঘেঁষে এসে দু'পা ছড়িয়ে ব'সে মাঝে মাঝে লোকটার পায়ের সংগে মুখ ঘ'ষে আদর জানাবার চেষ্টা করে।

কুকুরটার ঘন লোমের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে লোকটা বলে ঃ কিরে টাইগার ! কি খবর !

হ্যাপা, হ্যাপলা দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ঃ আর কতদিন এই পড়ো বাড়ীতে এমনি করে ভূতের মত কাটাতে হবে শুনি ?

কেন হে চাঁদ ! খাচ্ছদাচ্ছ আব দিব্যি নাক ডাকিয়ে দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই প্রায় ঘুমোচ্ছ, তবু মন ওঠে না কেন ?

এমনি করে বসে শুয়ে থাকতে থাকতে যে হাতপায়ে বাত ধরবার জোগাড় হলো।

তা নয় ধরলোই।

তা' ত' বলবেই !

যাক্ গিয়ে ওসব কথা ! কাল রাত্রের গাড়ীতে রাজাবাহাদুর আসছেন !

রাজাবাহাদুর !

হাঁ ঃ রায়পুরের রাজাবাহাদুর।

সে বেটা ত' কবে অক্কা পেয়েছে শুনেছি।

লোকে তাই জানে বটে!

খুট্‌ খুট্‌ করে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল : ঘরের মধ্যে দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। টাইগার হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে এবং তার কান দু'টো খাড়া হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করে টাইগার।

ন্যাপা সহসা ঝুঁকে পড়ে এক ফুঁ দিয়ে চট্‌ করে ঘরের মধ্যকার একটি মাত্র মোমবাতি নিভিয়ে দেয়।

এই, আলোটা নিভিয়ে দিলি কেন আহাম্মক? চাপা কণ্ঠে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করে।

দেখো মাষ্টার, তুমি বড় আহাম্মক!

টাইগার গোঁ গোঁ একটা অস্পষ্ট গর্জন করতে করতে ঘর হ'তে ছুটে বের হয়ে যায়।

কে যেন আসছে এদিকেই।

ঘেউ! ঘেউ! টাইগার গর্জন ক'রে ওঠে।

একটা উজ্জ্বল আলোর রশ্মি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল : বড় টর্চবাতির আলো!

নিজের অজ্ঞাতেই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্যাণ্টের পকেটে হাত চালিয়ে লোডেড্‌ পিস্তলটা বের করে ডান হাতের শক্ত মুষ্টিতে চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে।

বিষ্টু! গুলি করো না, আমি হে!—একটা ভারী কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

আরে কে ও! রাজাবাহাদুর! আসুন! আসুন! Thousand welcome! এই বেটা আহাম্মক, আলোটা জ্বালা না।

একটু পরেই ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হলো : মোম্‌বাতিটা জ্বালান হয়েছে। মোমবাতির আলোয় আগন্তককে স্পষ্ট দেখা যায় : মাঝারী ধরণের দোহারা চেহারা। দামী নেভি ব্লু সার্জের স্যুট্‌ পরিধানে। মাথার চুল সৌখীন ভাবে ছাঁটা : চুলের প্রায় তিনের চার অংশ পেকে সাদা হ'য়ে গেছে।

চোখের দৃষ্টিতে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি : খড়্গের মত উদ্ধত নাসা। শক্ত বিস্তৃত চোয়াল : প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় লোকটার গায়ে প্রচুর শক্তি আছে।

আপনার ত' কাল রাত্রের গাড়ীতে এখানে এসে পৌঁছবার কথা ছিল রাজাবাহাদুর !

কোন একটা জরুরী কারণে আজই চলে আসতে হলো ; কিন্তু তুমি আমাকে এখানে ও নামে ডেকো না বিষ্টু। I don't like to be exposed so soon. এখনও সময় আসে নি !

থাকবেন কোথায় ? এখানেই নাকি ?

না হে ! সে সব ঠিক আছে ! plan ঠিক করেই এখানে এসেছি।

কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন : আপনি হয়ত জানেন না, যে একটা ভৌতিক ব্যাপার এখানে কিছুকাল ধরে রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে ঘটছে, এবং আমার যতদূর মনে হয়, এর মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের কারসাজী আছে।

খুলে বল ?

খুলে বলবার মত বিশেষ কিছু নেই, আপনি যখন এসে পড়েছেন, ক্রমে দু'চার দিনে সবই জানতে পারবেন।

সে যাক্ ! তোমাদের কেউ কোন সন্ধান পায়নি ত' ?

না।

প্রশান্তকে দেখলে ?

হাঁ দেখেছি।

ছেলেটি কেমন ?

বোকা নয় এবং সংগে লেজে বেঁধে এনেছে তার এক গার্জেন টিউটর।

গার্জেন টিউটর ! কই কলকাতায় থাকতে তার কোন গার্জেন টিউটর আছে বলে ত' এমন কোন imformation আমি পাইনি ! কেমন দেখতে লোকটা ?

দূর থেকে দু'দিন দেখেছি, চেনা বলে ত' মনে হয় না।

ভাল করে নজর রাখবে লোকটার 'পরে।

আপনার এখানকার প্ল্যানটা কি জানতে পারি ?

• পুকুর থেকে মাছটা তুলে চালান দেওয়া, এই হচ্ছে প্রথম কাজ। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ বসাতে হবে।

কেমন করে সেটা সম্ভব হয়ে উঠবে বুঝতে পারছি না ত' ?

সেজন্য তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে বিষ্টুচরণ ! আচ্ছা, আমি তা'হলে চলি।

আবার কখন দেখা হবে ?

ব্যস্ত হবার কিছু নেই, সময় হলেই দেখা মিলবে। আচ্ছা Good night !

রাজাবাহাদুরের নিঃশব্দ প্রস্থান।

* * * *

হাঁ হে বিষ্টুবাবু! ব্যাপারটা যেন বেশ একটু গোলমেলে ঠেকছে

বিষ্টুচরণ কোন জবাব দেয় না : গালে হাত দিয়ে চুপ্‌চাপ বসে থাকে।

কি বাবা, তুমি যে একেবারে ঝিম্ মেরে গেলে! একটা আধটা কথা বল!

রাজাবাহাদুরের মেজাজটার কথা ভাবছি স্যাপা!

কেন কি আবার দেখলে মেজাজের মধ্যে? পরিচয়টা অবিশ্যি তোমার সংগে ওর আগে হতেই আছে, এবং তোমার কথাতেই এ কাজে আমি নেমেছি। ওর সাক্ষাৎ আমি ত' এই প্রথম পেলাম। তোমার জানাটা ওর সম্পর্কে আমার চাইতে সে কারণে বেশীই। দেখে শুনে ত আমার মনে হচ্ছে এবারে যেন বেশ উঁচু গাছেই মই বেঁধেছো। দেখো শেষ পর্যন্ত যেন মই থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভেংগে 'দ' না হও।

বিষ্টুচরণকে তেমনি বান্দা পাও নি।

বাইরে আবার এমন সময় কার মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া গেল : নিমে এলো নিশ্চয়ই, বিষ্টু বলে।

নিমে অর্থাৎ নির্মল এসে ঘরে প্রবেশ করল : এই যে, নরক যে একেবারে গুলজার। নির্মলের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত কিছু না হলেও একটা বিশেষত্ব আছে : লম্বায় মাঝারী গোছের হবে : দোহারা চেহারা, মাথায় ঢেউখেলানো চুল অতি পরিপাটি করে আঁচড়ান, মাঝখানে সিঁথি, গালের অর্দ্ধেকটা

পর্যন্ত জুলপী নেমে এসেছে। ঠোঁটের উপরে সরু চিকন করে গোঁফ ছাঁটা। চোখের কোলে কাজলটানা। গরুর চোখের মত বোকা ও ভাসা ভাসা চাউনী।

পরিধানে একটা ক্রিম রংয়ের ফুল প্যান্ট : গায়ে একটা সস্তা দামের নেটের গেঞ্জী, একটা ওপেন্ ব্রেষ্ট কোট্ এক কাঁধের 'পরে ঝুলছে, পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডেল রবার সোল দেওয়া, চোখে সোনার ফ্রেমে সৌখীন চশমা। গেঞ্জীতে বুকের কাছে একটা রাজা ফাউণ্টেনপেন গোঁজা।

নির্মলকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে হ্যাপা সোৎসাহে বলে ওঠে : আরে নিমে যে! The great film distributor. তারপর, এখন কার এ্যাসিস্টেণ্ট, কোন কোন বইতে যাতায়াত চলছে?

দেখ্ হ্যাপা, সব সময় তোর এ ইয়ার্কী ভাল লাগে না যেমন আছিস তেমনি থাক। ছোট মুখে বড় কথা সাজে না।

কেন ওকে ঘাঁটাচ্ছিস্ হ্যাপা?—বিষ্টু এবারে প্রতিবাদ জানায়। তারপর নির্মলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে : আবহাওয়া কেমন দেখছিস্ নিমে?

তেমন সুবিধের নয়! লোকটার সংগে আলাপ এখনও করতে পারিনি; তবে শুনলাম, ওর নাম ধূর্জটি প্রসাদ রায়, কোন এক বেসরকারী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের প্রফেসার। যাকে সাদা কথায় বলে 'ম্যাষ্টর'!

লোকটা তাহলে সত্যিই মাষ্টার!

সেই রকমই ত' শোনা গেল।

কতদিন প্রশান্তর গার্জেন টিউটার আছে শুনলি কিছু ?

না ! তবে এটা ঠিক ছেলেটাকে যেন একেবারে আগলে রেখেছে সর্বদা দু'চোখ ও দু'হাত দিয়ে। কার সাধ্যি তাকে ছোঁয় !

হু ! বিষ্টুচরণ যেন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠে।

—সাত— —আলোচনা—

ধূর্জটি স্পষ্টভাবে না বুঝলেও, অনুভব করছিল রায়পুরের আবহাওয়ায় বেশ একটা সন্দেহ যেন ক্রমে দানা বেঁধে উঠ্‌ছে এবং প্রশান্ত প্রথমটায় তার কাছে যতখানি সহজ হয়ে ধরা দিয়েছিল, এখন যেন আর ততটা সহজ বলে মনে হয় না। ওকে বেশ একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক বলেই মনে হয়, কি ও মনে মনে ভাবে তা ওই জানে।

ধূর্জটি দু' একবার ভেবেছে প্রশান্তকে খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু তখুনি আবার মনে হয়েছে, না, ও নিজে থেকে মুখ না খুললে ও পীড়াপীড়ি করবে না।

শুধু সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাবে এখন হ'তে প্রশান্তর উপর।

হাতে পর্যাপ্ত সময় প্রশান্তর। কোন কাজকর্ম নেই, সংগে করে আসবার সময় অনেকগুলো ইংরাজী ও বাংলা বই এনেছিল, অনেকটা সময় বই পড়েই কাটে।

কিন্তু কয়েকদিন হ'তে প্রশান্তর বইয়ের পাতায়ও যেন মন বসতে চায় না।

সামনে বই খোলা থাকে, ওর মন চলে যায় সুদূরের কোন কল্প লোকে।

মাঝে মাঝে গোপনে সেই চিঠিটা ও পড়ে।

চিঠিটার প্রতি ছত্রে ছত্রে একটা অদ্ভুত স্নেহ ও আকর্ষণ যেন ফুটে বের হতে চায়। এখানে আসবার দিন দশেক বাদে প্রশান্ত আবার সেই অদৃশ্য অচেনা লেখকের দ্বিতীয় পত্র পেল।

এবারের চিঠিটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত :

প্রশান্ত,

একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপারে তোমাকে পত্র দিচ্ছি।

সর্বদা খুব সাবধানে সতর্ক হ'য়ে থাকবে : যদিচ আমি সর্বদাই তোমার ভাল মন্দর প্রতি নজর রেখেছি, তথাপি তোমার বিপদ হওয়া একটা খুব আশ্চর্যর নয়।

কোথাও একলা যাবে না।

ধূর্জটি বাবুর সংগে ছাড়া কোথাও প্রাসাদ ছেড়ে যাবে না।

আঃ চিরশুভার্থী
তোমার কশ্চিৎ পিতৃ-বন্ধু

দ্বিতীয় পত্রখানা পেয়ে প্রশান্ত রীতিমত বিস্মিতই হয়।

তা'র জীবন বিপন্ন হ'তে পারে, এবং তার সম্ভাবনা আছে, এর মানে কি? তবে কি সে ধূর্জটি বাবুর নিকট সব কথা আগাগোড়া খুলে বলবে?

হাঁ। ধূর্জটি বাবুকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। এ নির্দেশ ইনিও দিচ্ছেন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর প্রশান্ত একে একে এ কয়দিনের সব কথা অকপটে ধূর্জটির নিকট খুলে বললে।

এসব কথা তুমি আগে আমাকে জানাওনি কেন প্রশান্ত?

আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি, এর মধ্যে এতখানি গুরুত্ব আছে।

তাহলে তোমাকেও আমি কয়েকটা কথা আজ রাত্রে বলবো। কিন্তু আমি কি ভাবছি জান?

কি?

তোমার জীবন হয়ত সত্যিই বিপন্ন। এই পত্র প্রেরক যেই হোন, ইনি সত্যিই তোমার হিতাকাংখী!

কিন্তু আমার জীবন কেন বিপন্ন হ'তে যাবে, সেইটাই আমি বুঝে উঠ্‌তে পারছি না ধূর্জটি বাবু!

হয়ত এমন interested party আছে, যাদের তোমাকে ইহলোক হ'তে সরাতে পারলে, লাভ আছে। তুমি আজ বিশাল সম্পত্তির মালিক। তোমার শত্রু থাকেই যদি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আচ্ছা, মিঃ হুডকে সব কথা খুলে বললে হয় না?

না, এসব ব্যাপার যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল।

হঠাৎ এক সময় প্রশান্ত প্রশ্ন করে : আচ্ছা ধূর্জটি বাবু, আপনার কি মনে হয় সত্যিই আজও আমার বাবা বেঁচে আছেন ?

ধূর্জটি কিছুক্ষণ প্রশান্তর কথায় গুম্ হয়ে কি যেন ভাবে, তারপর ধীরে ধীরে বলে : হয়ত সত্যিই বেঁচে আছেন তিনি প্রশান্ত।

কিন্তু ?

তিনি ফেরারী আসামী, খুনী, এই ত' !

হাঁ।

তাতে করে বেঁচে থেকেও কোন লাভ নেই, এই ত' বলতে চাও !

হাঁ।

সেটা এখন আমাদের বিবেচ্য নয়, কথা হ'চ্ছে তিনি বেঁচে আছেন কিনা ?

আচ্ছা ধূর্জটি বাবু, তাঁকে কি রক্ষা করবার কোন উপায়ই নেই ?

প্রশান্তর কিশোর সুলভ সরল প্রশ্ন ধূর্জটির মনকে বিষন্ন করে তোলে। নিজেকে সে বিপন্ন মনে করে। প্রথমটাতে ও ভেবেই পায়না কি জবাব দেবে প্রশান্তর প্রশ্নের, আর কি জবাবই বা ও দিতে পারে।

জগৎটা বড় কঠিন জায়গা।

কিশোর মনের সরল বিশ্বাসের দাম এখানে কতটুকু ?

সত্যি কথা খুলে বলতে গেলে বালককে ব্যথা দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। তবু সত্যের অপলাপ করতে ধূর্জটির কেন না জানি এতটুকুও দ্বিধা বোধ হয় না। একটু ভেবে সে বলে: নিশ্চয়ই। তবে চট্ করে একটা কিছু বলা যাবে না। ভেবে চিন্তে দেখতে হবে।

আচ্ছা ধূর্জটি বাবু, বাবা যদি তাঁর সব দোষ স্বীকার করেন, ক্ষমা চান ?

আইন তাঁকে ক্ষমা করবে না ভাই: এই সহজ কথাটা যেন ধূর্জটির কণ্ঠে এসেও আটকে যায়। বলে, সে আইনের কথা আইনই বলতে পারে প্রশান্ত। আমরা ওর সূক্ষ্ম মার প্যাঁচ সব সময় কি বুঝে উঠতে পারি।

ধূর্জটির কথায় প্রশান্ত মনে কিন্তু সান্ত্বনা পায়।

* * *

প্রশান্তর ডাইরী থেকে:

আইন কি বলবে জানিনা! কিন্তু মনে হয় আইন বড় নিষ্ঠুর। বাবা অপরাধী সন্দেহ নেই। তিনি নিজে হাতে তার ভাইকে হত্যা করুন নাই করুন, হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং দাদু নিশানাথ ও তাঁর সহকর্মী সতীনাথ বাবুকে হত্যা করেছেন।

আইন বলে, হত্যাকারীর দণ্ড একমাত্র ফাঁসী।

আজ সত্যিই যদি তিনি বেঁচে থাকেনই, ধরা পড়লে বিচারে নিশ্চয়ই তাঁর ফাঁসীর হুকুম হবে।

কেন যে তিনি জাষ্টিস্ মৈত্রর কাছে চিঠি লিখে সব স্বীকার করতে গেলেন, তা তিনিই জানেন।

আজ যদি তিনি নিজে হ'তে সব স্বীকার না করতেন, কেউ তাঁর অপরাধ প্রমাণ করতে পারতো না।

এ সংসারে আমার কেউ নেই : আমি একা!

আজ যে বিশাল সম্পত্তির সংগে নৃশংস ভ্রাতৃহত্যার রক্ত লেগে আছে, এর থেকে কোন মংগল বা শান্তি আসতে পারে না, না! না!...চাইনা আমি এ অর্থ! চাই না এ সম্পত্তি! যার খুশী সেই এ নিক। আমি নিজে উপার্জন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবো।

বাবা! আমার বাবা! সত্যিই তুমি আজও বেঁচে আছো কিনা জানিনা। যদি সত্যিই বেঁচে থাকো, তাহলে আমাকে বলে যাও, কেন এ নিষ্ঠুর জঘন্য কাজ তুমি করলে! ভ্রাতৃহত্যার রক্তে হাত তোমার কলংকিত করলে কেন?

আমার জীবনে এমনি করে অভিশাপ এনে দিলে কেন?

* * * *

আর লেখা হয় না—প্রশান্তর হু'চোখের কোণ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

* * * *

ধূর্জটিও ভাবছিল, বেচারী প্রশান্তরই কথা।

কি কুক্ষণেই রায়পুরের রাজবংশে পাপের বীজ এসে প্রবেশ করেছিল। ক্রমে সেই বীজ হ'তে মহীরুহ জন্ম নিয়েছে, আজ

সেই মহীরুহের অসংখ্য ডালপালা রায়পুরের রাজবংশকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

কিন্তু উপায় কি!

এ অভিশাপের কলংক হ'তে একে রক্ষা করা সত্যিই আজ দুঃসাধ্য!

নল রাজার দেহে যেমন শনি প্রবেশ করেছিলেন, এও ঠিক তাই!

হয়ত বিধাতার অভিশাপ।

অর্থের লোভে মানুষ যে কত নীচে নেমে যেতে পারে, এই রাজবংশের গত কয়েক বৎসরের পাতাগুলো উল্টালে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

পুরান দিনের পাপের ফল আজ প্রশান্তর মাথার পরে ভেংগে পড়েছে। এবং এই পাপের আগুনে নিষ্পাপ প্রশান্তকেও পুড়ে মরতে হবে।

নিয়তির এই-ই হয়ত অলংঘ্য নির্দেশ!

* * *

সে রাত্রে ধূর্জটি ও প্রশান্তর মধ্যে অনেকক্ষণ ধ'রে আলোচনা হলো এবং ভবিষ্যতে উভয়ে কি ভাবে কাজ করবে তারও একটা মোটামুটি খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেল।

আবার রাত্রির কালো অন্ধকারের স্রোত নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে, কালো হিংস্র বন্যার মত। ক্ষুধিত বন্য জন্তুর মত কালো আকাশপটে ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে তারাগুলো।

একটা থম্‌থমে ভারী জমাট স্তব্ধতা'যেন রাত্রির অন্ধকারকে নিষ্ঠুর বেষ্টনে আঁকড়ে ধরেছে চারিদিক থেকে।

বাতাসের লেশমাত্রও নেই কোথাও।

ধূর্জটির চোখে ঘুম ছিল না ঃ অন্ধকার নিদ্রাহীন চোখ দু'টো মেলে সামনের দিকে সে তাকিয়েছিল।

অন্ধকারে এমনি করে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকতে তা'র ভাল লাগে, চিন্তার অনেক অমীমাংসিত জট্ পাকানো সূত্রের যেন জট্ খুলে যায়।

আচম্‌কা শ্রবণেন্দ্রিয় যেন সজাগ হ'য়ে ওঠে ঃ একটা চাপা সতর্ক পায়ের শব্দ, খুব ধীরে ধীরে যেন মিলিয়ে গেল।

জাগ্রত সদা সতর্ক ধূর্জটি নিঃশব্দে শয্যার 'পরে উঠে বসে ঃ অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ঃ অন্ধকারের বুকে একটা অস্পষ্ট আবছা আলোর দ্যুতি হঠাৎ যেন ইসারা দিয়ে গেল না! দ্রুত নিঃশব্দ পথে শয্যা হ'তে উঠে দরজাটা খুলে সে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়; বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে একেবারে দূর নদীর ধার পর্যন্ত অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে জংগল।

ওরই মাঝে মাঝে জংগলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে

দু'একটা কুড়ে ঘর আর পায়ে চলার অস্পষ্ট পথ-রেখাটা ক্বচিৎ দু'এক জায়গায় যেন চকিত ইসারা দিয়ে মিলিয়ে গেছে জংগলের মধ্যে।

এসব কিছুই দিনের বেলা ছাড়া চোখে পড়ে নাঃ ধূর্জটি বারান্দা দিয়ে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পনে এগিয়ে চলে; হাঁ এতক্ষণে ঐ বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি একটা দেখা যাচ্ছে; এবং তার হাতে চারিদিকে কাগজ দিয়ে ঢাকা একটা লণ্ঠন বাতি। বাতিটা মাথার উপরে দু'হাতে তুলে ধরা হয়েছে এবং এদিক ওদিক হেলছে দুল্‌ছে।

ধূর্জটি আবার এগিয়ে চলে, ছায়ামূর্তি তখনও একই ভাবে লণ্ঠন বাতিটা দুলিয়ে চলেছে, আপন মনে। ধূর্জটির নিঃশব্দ আগমন একেবারেই টের পায় নি।

উভয়ের মধ্যে মাত্র হাত ছয়েক ব্যবধানঃ লোকটার গায়ে একটা চাদর জড়ান।

ধূর্জটির চিনতে দেরী হয় না, লোকটা কে! ও বিস্মিত কম হয়নি; এমনি করে লণ্ঠন বাতি দুলিয়ে অন্ধকার রাত্রে কাকে ও নিশানা দিচ্ছে, পিছন হ'তে সামনের অন্ধকারে কিছু দৃষ্টিও চলে না এবং বুঝবারও উপায় নেই।

প্রায় মিনিট দশেক একইভাবে লোকটা আলোটা দুলিয়ে, আলোটা নামিয়ে নিল। এখুনি হয়ত লোকটা ফিরে দাঁড়াবে, চট্ করে ধূর্জটি বারান্দার একটা থামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। সত্যিই লোকটা লণ্ঠন বাতিটা নামিয়ে নিভিয়ে দিল।

নিমেষে নিশ্ছিদ্র আঁধারে জায়গাটা অবলুপ্ত হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

ধূর্জটি থামের আড়াল থেকে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লোকটাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

লোকটা আলোটা একপাশে নামিয়ে রেখে দেওয়ালের গায়ে যেন শ্রান্ত ভংগিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

একই ভংগীতে লোকটা প্রায় অমনি করে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নীচু হ'য়ে বাতিটা তুলে নিয়ে শ্লথ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ফিরে যায়।

* * *

আরো প্রায় ঘণ্টা দুই পরে।

রাত্রি এখন দু'টো বাজে : প্রাসাদের সেই কক্ষ, যেখানে একদা রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক থাকতেন। এখন প্রায় বন্ধই থাকে।

যে ঘরের সংলগ্ন ছাদ আছে, সেই ঘরের মধ্যে, একটি লোক নিঃশব্দে অন্ধকারে পায়চারী করছে অস্থির বিক্ষুব্ধ পদে।

অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে শোনা যায় ওর স্বগতোক্তি : বিমলা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হবে বলতে পারো? এই রাতের পর রাত প্রেতের মত প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এ থেকে কবে আমার ছুটি মিলবে? কবে এ প্রেত পুরী হ'তে আমার মুক্তি মিলবে? তুমি ঠিকই বলেছিলে বিমলা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে একদিন করতে হবে। তোমার কথায় সেদিন কান দিইনি। বিমলা, আজ তুমি কতদূরে কোন অদৃশ্য-

লোকে আত্মগোপন করে আছো জানিনা। সম্মুখে তৃষ্ণার বারি, কণ্ঠে আমার আকণ্ঠ পিপাসা, অথচ স্পর্শ করবারও আমার অধিকার নেই। বুঝতে পারো, এ কি নিষ্ঠুর জ্বালা!

উঃ! একি হলো আমার! তাসের ঘরের মত আমার সমস্ত আশা আকাংখা ভেংগে গুঁড়িয়ে গেল।

আমার সোনার প্রাসাদে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।...

বাইরে বন্ধ দরজার ওদিকে মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। লোকটি তার পায়চারী বন্ধ করে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

পদশব্দ ক্রমে নিকটে, আরো নিকটে আসছে: বন্ধ দরজার কবাটে পর পর অতি ধীরে তিনটি শব্দ শোনা যায়।

লোকটি ধীরে দরজা খুলে দেয়, চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে: কে, শম্ভূ?

হাঁ!

ঘুমুচ্ছে?

হাঁ!

আর সে?

সেও ঘুমুচ্ছে।

একবার যেতে পারি সেখানে?

না!

একটিবার যাবো, শুধু অন্ধকারে একটিবার দেখেই আবার চলে আসবো

না, তোমাকে বিশ্বাস নেই।

শম্ভু, একটিবার যেতে দাও! প্রতিজ্ঞা করছি তাকে স্পর্শও করবো না। আজ চার দিন তাকে একটিবার দেখিনি, শুধু একটিবার, হাঁ একটিবার শুধু তাকে দূর থেকে দেখেই আবার চলে আসবো।

কিন্তু তাতে লাভ কি?

লাভ! অন্ধকারে বক্তার ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ বিষণ্ণ একটুকরো হাসির আভাষ বুঝি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। বেদনার অশ্রুবাষ্পে বুঝি গলা দিয়ে স্বরও ফোটে না: কেমন করে তোমাকে সে কথা বোঝাব শম্ভু, দূর থেকে তাকে একটিবার মাত্র দেখে কি আমার লাভ!

তুমি ত' তার কাছে মৃত!

হাঁ। জানি তার কাছে আজ আমি মৃত! একটা আর্ত-করুণ চিৎকারের মত কণ্ঠস্বর শোনা যায়: সেই ভাল। বেঁচে থেকে আমার লাভ কি!

কেন মিথ্যে মৃতের স্মৃতিকে আবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোল, তাতে দুঃখই বাড়বে বইত নয়।

সমুদ্র প্রমাণ পিপাসা নিয়ে বুক ভরে আমি চোরের মত গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছি, দুনিয়ার কাছে আজ আমি মৃত! মৃত বলেই ত' তার কাছে আমি যেতে চাই! যদি তার ঘুম ভেংগেও যায়, সে জানবে শুধু স্বপ্ন মাত্র!

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে, জানাজানি হয়ে গেলে, সর্বনাশ হবে!

আর বেশী কি সর্বনাশ হ'তে পারে শম্ভু। ঘর আমার পুড়ে গেছে, রাজার ঐশ্বর্য থেকেও আজ আমি ভিখারীরও অধম! খুনী ফেরারী আসামী : অন্ধকারের পথে ঘাটে জংগলে সর্বদা আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছি, ধরতে পারলে পুলিসে ফাঁসীর দড়িতে লট্‌কে দেবে। মানুষের এর চাইতে আর বড় সর্বনাশ কি হতে পারে বলতে পারো ?

নিজে সেধে এ দুঃখকে তুমি ডেকে এনেছো!

মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে আমার চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে, মনে হয় তাহলে হয়ত বুকের এ গুরুভার কিছুটা লাঘব হতো! কিন্তু কই তাও ত' পারি না।

শম্ভু মাথা নীচু করে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি জবাব দেবে সে!

রাত্রি প্রায় ভোর হ'য়ে এলো ; এবারে তুমি চলে যাও, এ তোমার শত্রুপুরী এখানে যে কোন সময় তোমার বিপদ ঘটতে পারে।

হাঁ যাই! আবার ও চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ায় : শম্ভু, একটা কথা।

কি ?

সত্যিই কি আজও ও বিশ্বাস করে আমি মৃত!

হাঁ! এবং সেটাই উভয়ের পক্ষে মংগল।

মংগল!

হাঁ, মংগল।

বেশ তবে তাই হোক, নিঃশব্দে একপ্রকার টলতে টলতেই

সে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, ঘরের সংলগ্ন ছাদ অতিক্রম করে, ছাদের প্রাচীরের গায়ে ঝুলন্ত দড়িটা বেয়ে নীচে নেমে, অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

বন্য কালো অন্ধকারের স্রোত যেন মুহূর্তে তাকে গ্রাস করে নিল।

কোথায় একদল শিবা রাত্রির চতুর্থ প্রহর ঘোষণা করল তারস্বরে ডেকে উঠে।

* * *

রাত্রি দু'টো : ঐ দিনই সহরের একটা বাড়ীতে।

দুই জন লোকের গোপন পরামর্শ বসেছে।

ঘরের এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে টিপ্ টিপ্ করে।

রাজাবাহাদুর, কাজটা যত সহজ মনে করছেন আসলে মোটেই হয়ত তত সোজা হবে না।

কেন ?

হুডের যে দু'টি দারোয়ান আছে, লোক দু'টো নেহাৎ সোজা নয়, আজ কয়দিন থেকে দেখছি, লোক দু'টো সারারাত্রি জেগে রাজবাড়ীর সর্বত্র রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয়। তারপর ঐ পুরোন চাকর শম্ভু; ও একটা বাস্তু ঘুঘু। ও বেটা যেন শকুনের মত সর্বদা শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে!

সামান্য এ কাজটা যদি না পার তাহলে এত টাকা খরচ করে তোমাদের আমার এখানে আনবার কি এমন প্রয়োজন ছিল বিষ্টু!

কিন্তু ব্যাপারটা যে এত ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়াবে, তা কি আগে বুঝতে পেরেছি রাজাবাহাদুর!

তুমি ন্যাপা আর কৈলাস, তিনজনেও এই সামান্য কাজটা হাসিল করতে পারবে না?

পারবো না এমন কথা বলিনি। তবে আট ঘাট বেঁধে এগুতে হবে।

আট ঘাটটা যত তাড়াতাড়ি বেঁধে উঠ্‌তে পারো বিষ্টু ততই ভাল, কারণ হাতে আমাদের সময় অত্যন্ত অল্প!

ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় তোলা হবে?

বরাবর নৃসিংহ গ্রামের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুলবে; সেখানকার নায়েব ভবানী রায় আমাদের লোক, সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে সেই প্রাসাদে তোলা পর্যন্ত তোমাদের ডিউটি, তারপরই তোমাদের ছুটি।

টাকা কড়ির ব্যবস্থা?

সেখানে ছেলেটাকে নিয়ে তুললেই, ভবানী তোমাদের সব পাওনা গণ্ডা নগদ মিটিয়ে দেবে!

দশ হাজার টাকার কম হবে না কিন্তু তা আগেই বলে দিচ্ছি।

দশ হাজার! তোমরা কি ক্ষেপে গেলে বিষ্টু!

না রাজাবাহাদুর ক্ষেপে যাইনি, কিন্তু কাজটার কথা একবারও ভেবে দেখেছেন কি?'

পাঁচ হাজার পাবে।

পাঁচ হাজারে মানুষ গায়েব করা যায় না।

এখন আর গোলমাল করো না বিষ্টু, কাজ হাসিল হ'য়ে যাক্ তারপর সবাইকে আমি তোমাদের খুসী করে দেবো।

বিষ্টু শর্মা স্বপ্ন দেখে না রাজা বাহাদুর। সব নগদা বিদায় চায়।

বেশ তাই হবে।

কিছু আগাম চাই।

কত ?

হাজার তিনেক।

তিন হাজার আগাম!

তা যেমন ঠাকুরের পূজো তার তেমনি নৈবিদ্যি ও দক্ষিণা দিতে হবে বইকি!

গুম্ হয়ে লোকটা কি যেন কিছুক্ষণ ভাবে তারপর বুক পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা চামড়ার পার্স টেনে বের করে। পার্সটা খুলতেই, তার মধ্যে দশটা করে পিন্আপ্ করা আনকোরা একশত টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল বের হয়ে পড়ে। লোভে বিষ্টুর চোখের মণিদু'টো যেন ঝক্ ঝক্ করে ওঠে।

এই নাও। ত্রিশটা একশত টাকার নোট বাণ্ডিল হ'তে খুলে গুনে লোকটা বিষ্টুর প্রসারিত হাতের মধ্যে তুলে দেয়।

লোভী ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন একখণ্ড মাংস পেলে সেটাকে

দু'পায়ের দশটা ধারালো নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে ঠিক তেমনি করে শীর্ণ বড় বড় বাঁকানো আংগুলগুলো দিয়ে বিষ্টুচরণ নোটগুলো চেপে ধরে।

জিহ্বা ও তালুর সহযোগে একটা টুক্ করে অদ্ভুত শব্দ করে O. K. ! Boss !......

বাকী টাকা কাজ শেষ করলে পাবে। ভবানীই তোমাদের পাওনা গণ্ডার শেষ পয়সাটা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবে।

বেশ।

হঁা, আর একটা কথা। নৃসিংহপুরের বাড়ীতে মাল পৌঁছে দেওয়া পর্যন্তই তোমাদের duty—তোমাদের কাজ সেখানেই শেষ। মাল পৌঁছে দিয়েই তোমরা ওখান হ'তে সোজা কলকাতায় চলে যাবে।

তাই হবে! কিন্তু আমারও একটা কথা বলবার ছিল রাজাবাহাদুর।

ভ্রূ কুঁচকে রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করে: কি ?

দেখুন, এ ধরণের কাজে বড় ঝামেলা। খুনটুনের মধ্যে যেন যাবেন না। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বলছি খুনের রক্ত মুছে ফেলা যায় না। সরকারের চোখে ধূলো দিতে পারলেও উপরে একজন যে বসে আছেন তার চোখে ধূলো দেওয়া যায় না কোনদিনও। আর ঐ মূক দেবতাটি সর্বদা চুপ করে বসে থাকেন বটে আফিংখোরের মত, কিন্তু কখন যে ঝট্ করে চোখ খুলে কি করে বসবেন কেউ তা বলতে পারে না।

থামো হে, চোরের মুখে আর ধর্মনীতি ভাল লাগে না।

পরের চক্রে তেল না ঢেলে, যে কাজের ভার নিলে আগে সেটা হাসিল করো গে।

না, বললাম এই আর কি! গরীবের কথা আবার বাসী হলে মিঠে লাগে কি না?

আচ্ছা এখন তুমি যাও।

বেশ। চললাম রাজাবাহাদুর! বিষ্টুচরণ ঘর হ'তে শ্লথ পদে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যায়।

ফুঁ দিয়ে রাজাবাহাদুর আলোটা নিভিয়ে দিল: ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে গেল।

রাজাবাহাদুর উঠে ঘরের বন্ধ জানালার কবাট দু'টো ভাল করে খুলে দেয়: আকাশে আজ চাঁদ নেই, তারার স্তিমিত আলোয় যেন আকাশ ও মৃত্তিকার মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়ার মায়া রচনা করেছে।

জানালার শিক ধরে নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রাজাবাহাদুর অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

বাইরের বারান্দায় কার যেন মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, পকেটের মধ্যস্থিত পিস্তলটা ডানহাতের মুষ্টিতে শক্ত করে ধরে রাজাবাহাদুর মুহূর্তে সতর্ক হয়ে ফিরে দাঁড়ায়: অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকায়, দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল বিষ্টুচরণ চলে গেলে: কে?

আমি কৈলাস।

কৈলাস! এসো! কি সংবাদ!

একটা ভাল সংবাদ আছে রাজাবাহাদুর।

কি ?

আলোটা জ্বালাবো ?

না থাক, অন্ধকারই ভাল। বল কি সংবাদ এনেছো ?

সব পরশু শিকারে যাচ্ছে শালবনে।

তাই নাকি ! কি করে জানলে একথা ?

কি করে আর জানব, হুড্ সাহেবের বেয়ারা সুখনের কাছে খবরটা শুনলাম।

হাঁ। Good news ! সুখবরঃ সংবাদটার সংগে সংগেই রাজাবাহাদুরের মাথার মধ্যে একটা মতলব খেলে গিয়েছিল, চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেঃ একবার বিষ্টুচরণকে এখুনি গিয়ে আমার নাম করে ডেকে আনতে পার কৈলাস ? বলবে খুব জরুরী।

নিশ্চয়ই, সেই বাড়ীতেই আছে ত ?

হাঁ, সে বোধহয় এখন সেখানেই আছে, যাও !

—নয়— —অনুতাপ—

কৈলাস অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে ; যে সংবাদ সে এনে দিয়েছে আজ রাজাবাহাদুরকে তার ইনাম সে ভালই পাবে, তা সে জানে। টাকার বড্ড প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। শক্ত কাজ সেও অনায়াসেই হাসিল করে দিতে পারে, রাজাবাহাদুর তাকে শক্ত কাজ দিয়ে বিশ্বাস করেন না, তা নাহলে ওকে না বললেও ওকি বুঝতে পারে নি রাজা-

বাহাদুরের কেন ও ছেলেটার দিকে এত কড়া নজর। কি আসল উদ্দেশ্য ওর, ও সবই বুঝতে পেরেছে, ওই ছেলেটাকে সরিয়ে রাজাবাহাদুর গদীতে বসতে চায় এবং বিষ্টুচরণকে দিয়ে সেই কাজটা করাবার মতলব এঁটেছেন।

কিন্তু আসলে কে এই রাজাবাহাদুর লোকটা? পরিচয় দিয়েছে বটে উনিই নাকি রায়পুরের ভবিষ্যৎ গদীর মালিক ঃ রাজাবাহাদুর। তাই যদি সত্যি হবে, তাহলে এত লুকোচুরি কেনরে বাবা? সোজাসুজি এসে নিজের পরিচয়টা দিয়ে গদীতে চেপে গেলেই চলে।

এত ঝামেলা কিসের!

এ ত' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটাকে সরিয়ে তবে গদীতে বসতে চান পাকাপোক্তভাবে, যাতে ভবিষ্যতে গদীর মালেকান সত্ব নিয়ে কোন ভাগাভাগির গণ্ডগোল না পোহাতে হয়।

এই রায়পুরের রাজবংশেরই লোক কি উনি! কিন্তু উনি যে রায়পুরের সেই পলাতক রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক নয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কৈলাসের। তাই যদি হতেন তাহলে তার এভাবে আসা চলতো না; খুনী পলাতক ফেরারী আসামী, পুলিশের লোকেরা ওকে হাতে পেলে ফাঁসীর দড়িতে নিশ্চয়ই ঝুলিয়ে দেবে।

তবে লোকটা কে?

যেমন করেই হোক লোকটার সত্যকারের পরিচয় জানা দরকার। লোকটা এখানে আসা অবধি আত্মগোপন করেই

আছে ঃ বলে, সময় এখনো আসেনি, এলেই আত্মপরিচয় দিয়ে গদীর দখল নেবে।

লোকটা জালীয়াৎ নয়' ত। তাই বা কে জানে।

রাত্রি কত হবে কে জানে। কোথাও কেউ জেগে নেই ঃ সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভূতের মত নিজের ছায়া ফেলে স্তিমিত আলোছায়ায় কৈলাস এগিয়ে চলে।

*　　　　*　　　　*

বিষ্টুচরণ বাসাতেই ছিল। রাত্রি অনেক হয়েছে, রাত্রের মত বিশ্রামের ব্যবস্থা করছিল, এমন সময় কৈলাস এসে দরজায় ধাক্কা দেয়।

কে ?

আমি কৈলাস, বিষ্টু বাবু !

কৈলাস, এত রাত্রে ? বিষ্টুচরণ দরজাটা খুলে প্রশ্ন করে সবিস্ময়ে।

ঘরের এক কোণে অন্ধকারে ন্যাপা মাদুরের পরে শুয়ে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ নাক ডাকছে।

জরুরী তলব ! রাজাবাহাদুর ডেকেছেন, এখুনি একবার যেতে হবে।

কেন, কি এত জরুরী ব্যাপার এর মধ্যে ঘটে গেল, এইত' কিছুক্ষণ হলো তার ওখান থেকে আসছি।

অত শত জানিনা বাপু ! বলেছে এখুনি ডেকে নিয়ে যেতে, এলাম ডাকতে, চল।

চল!

বিষ্টুচরণ জামাটা আবার গায়ে পরে নেয়, মুখে চোখে সুস্পষ্ট বিরক্তি, কিন্তু কিছু বলবার নেই, বুক পকেটে করকরে নোটগুলো এখনো ভরে আছে। মনে মনে অতি নিকটতম সম্পর্কে রাজাবাহাদুরকে সম্বোধন করে পা বাড়ায়।

*　　　*　　　*

পরের দিন রাত্রের কথা ঃ সেই সাঁওতাল পল্লী।

মুন্না সর্দারের ঘরে গোপন পরামর্শ চলেছে, অত্যন্ত চুপি চুপি।

ঘরের মধ্যে মাত্র দু'টি প্রাণী ঃ মুন্না সর্দার ও ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তির সংগে মুন্নার যে পরামর্শ চলেছে, তা কারো কর্ণগোচর হয়, মুন্না বা দ্বিতীয় ব্যক্তির আদতেই তা ইচ্ছা নয়।

ঘরের এককোণে একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছে দপ্ দপ্ করে।

ছায়ামূর্তি একটা বেতের মোড়ার 'পরে বসে, সামনে উবু হয়ে বসে সাঁওতাল সর্দার মুন্না।

ঘরে চেরাবাঁশের মাটি দিয়ে লেপা দেওয়ালে কুপীর লাল আলো পড়ে কাঁপছে।

বাড়ীর অতলান্ত অন্ধকার রাত্রি থম্ থম্ করছে ঃ মাঝে মাঝে শোনা যায় বাঁশঝাড়ের সরু চিকণ পাতায় বাতাসের কাঁপন, সর সর করে অদ্ভুত শব্দ তোলে।

সাঁওতাল পল্লীর কুকুরগুলো মাঝে মাঝে নৈশ-রাত্রির জমাট স্তব্ধতা ভংগ করে।

কিন্তু পুলিশের লোকের সংগে কেমন করে লড়বি রাজা? ওদের অনেক লোক গোলাগুলি।

আমিও প্রচুর গোলাগুলি জোগাড় করেছি গোপনে! সব জমা করে রেখেছি নৃসিংহ গ্রামের প্রাসাদে, সেখানে ভবানী আছে, সে আমারই লোক। তাছাড়া সে বাড়ীটা একটা দুর্গের মত। প্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ করে দিলে চট্‌ করে কেউ প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না। খাবার দাবারও এক-সপ্তাহের মত জোগাড় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, ১৫ দিনের মত জোগাড় হলেই কাজ হয়ে যাবে। আমার কাছে দু'টো রাইফেল, একটা রিভলভার ও অনেক কার্তুজ আছে, আর তোদের আছে ধনুক ও বিষ মাখানো তীর। ছাদের ওপর থেকে প্রাচীরের আড়ালে বসে আমরা গুলি ও বিষের তীর ছুঁড়বো, কতক্ষণ ওরা যুঝবে?

ওরা আরো লোক নিয়ে আসবে, তখন?

সে তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।

বেশ, তুই হামাদের রাজা, যেমনটি বলবি, তেমনটিই করবো।

আচ্ছা তাহলে সেই কথাই রইলো: লোকটা উঠে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওখান থেকে সে সোজা চলে আসে রায়পুরের প্রাসাদে, শম্ভু ওরই অপেক্ষায় ছিল:

শম্ভু, আবার এসেছি, খোকা কেমন আছে?

ভাল!

'এমনি করে চোরের মত আমি আর লুকিয়ে থাকতে পারছি না শম্ভু। আমি রায়পুরের রাজা, রাজার মতই আমি আমার এই গোপন প্রহেলিকা ছিন্ন করে আত্মপ্রকাশ করবো।

'সর্বনাশ! পুলিশের লোকেরা জানে তোমার মৃত্যু হয়েছে, কেন তবে মিথ্যে ধরা দিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবে!

'কিন্তু এভাবে চোরের মত আত্মগোপন করেই বা মানুষ বাঁচে কেমন করে!

'এ তোমার পাপের ফল রাজাবাবু!'

'পাপের ফল! হয়ত তোমার কথাই ঠিক্ শম্ভু। কিন্তু তবু এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুও শতগুণে শ্রেয়। আর তাছাড়া এ জীবনে আর বেঁচে থেকে লাভই বা কি? খুনী, পলাতক আসামী আমি। যে পাপ আমি নিজ হাতে করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজেই করবো। হাঁ, নিজেই করবো। কিন্তু একটা অনুরোধ তোমার কাছে শম্ভু!

'বল।

'প্রশান্ত! আমার স্বপ্নের প্রশান্ত, আমার এই হতচ্ছন্ন জীবনের শেষ আশার আলো, সে যেন আমাকে শুধু ঘৃণাই না করে। তাকে ব'লো...

কান্নায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

শম্ভুর চোখেও বুঝি অশ্রু!

পাপের কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

বিধাতার বিচার, এ বুঝি এমনিই নির্মম! এমনি অকরুণ!

* * *

ঠিক হয়েছে আগামী কাল শালবনীতে সকলে মিলে শিকারে যাওয়া হবে।

মিঃ হুড্, ধূর্জটিবাবু, প্রশান্ত আর ষ্টেটে চাকুরী করেন, মিঃ হুডের সহকারী বিশ্বনাথ বাবু।

শিকারের আনন্দে প্রশান্ত মেতে উঠেছে। গল্পে কাহিনীতে মৃগয়ার কথা প্রশান্ত পড়েছে, অপূর্ব একটা রোমাঞ্চ ও অনুভব করে।

প্রশান্ত ও ধূর্জটি ভাবছে মৃগয়ার কথা ঃ পশু মৃগয়া।

আর একদলও ভাবছে মৃগয়ার কথা ঃ মানুষ মৃগয়া।

## —দশ— —মৃগয়া—

রায়পুর ষ্টেটের শালবনী সত্যি সত্যিই অপূর্ব জায়গাটি ঃ কিন্তু শালবনীর প্রথমদিকে যে ঘন জংগল, সেখানে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো প্রবেশের পথ পায় না ; ঘন পত্র-বহুল শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়ে যে সামান্য আলো টুকু প্রবেশাধিকার পায় তাও এত সামান্য যে দিনের বেলাতেও মনে হয় যেন আলো-ছায়া ঘেরা মোহময় স্থানটি।

চারিদকে অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা ঃ সে ভয়াবহ স্তব্ধতার মধ্যে মানুষ পথ হারায়, চলতে সশংকিত হয়ে ওঠে প্রতি পদ বিক্ষেপে।

মধ্যে মধ্যে অরণ্য মর্মর, বনদেবী যেন স্তব্ধতার মধ্যে বসে দীর্ঘশ্বাস মোচন করছেন।

একটা শান্ত শীতলতা যেন ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত সর্বাংগ বেষ্টন করে ধরে।

জংগলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে ঃ এপথে লোক চলাচল খুবই কম, কেউ একা চলে না, যখন যেতে হয় দল বেঁধে যায়।

জংগলের মধ্যে নানাপ্রকার বন্যজন্তু আছে ; বরাহ, হরিণ, নেকড়ে, চিতা, নানাজাতীয়।

এটা ষ্টেটের রিজার্ভ ফরেষ্ট্।

কাউকেই এখানে শিকার করতে আসতে দেওয়া হয় না।

জংগলের চারিপাশে প্রহরী নিযুক্ত রাখা হয়েছে ষ্টেটের পক্ষ থেকে।

এই বনপথ দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া আছে সকলকেই কিন্তু কেউ কোন অরণ্যচারী পশুকে আঘাত করতে পারবে না বা হত্যা করতে পারবে না একান্ত প্রয়োজন না হলে।

গাড়ীতে চেপে জংগলের ঠিক কাছাকাছি এসে সকলে গাড়ী হ'তে নেমে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয় ; বেলা সাড়ে ছয়টা হবে ঃ সবে সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শিশির-সিক্ত বনপথ, সংকীর্ণ পায়ে হাঁটা বনপথ।

দু'পাশের গাছপালাগুলো যেন সারারাত্রির পর নিদ্রাভংগে আড়ামোড়া ভাংগছে।

অদ্ভুত একটা শান্ত ঠাণ্ডা ভাব চারিদিকে।

কিচির মিচির পাখীর ডাক ঃ জানায় প্রভাতী বন্দনা।

ওরা এগিয়ে চলে।

অরণ্যের মায়াঃ স্নিগ্ধ মায়া; অন্তরকে যেন নিঃশব্দে স্পর্শ করে।

সকলের পায়েই রাবার সোলের জুতোঃ জুতোর শব্দ শুনে পাছে না শিকার পালিয়ে যায় তাই এ সতর্কতা। ধূর্জটি ও হুডের হাতে একটি করে দোনলা বন্দুক, প্রশান্তর হাতেও একটা একনালা বন্দুক। তাছাড়া চাকরের স্কন্ধে বেতের টুক্‌রীতে আহার্য ও বড় বড় দু'টো ফ্লাস্কে গরম চা। মিঃ হুড্ পাকা শিকারী, প্রায়ই তিনি এখানে শিকার করতে আসতেন, তাই তাঁর শিকারের সাজ-সরঞ্জামেরও অভাব নেই।

ঠিক পায়ে চলা পথ ধরে এগুলে চলবে না। ঘন জংগলের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, তা নাহলে শিকারের সন্ধান মিলবে না। কাজেই স্থির হলো সকলে দুই ভাগ হ'য়ে যাবে, এক ভাগে মিঃ হুড্ ও তার সহকারী বিশ্বনাথ বাবু, অন্যদলে ধূর্জটি বাবু, প্রশান্ত ও ভৃত্য মাধব। বেলা দু'টোর সময় সকলে আবার নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হবে, টিফিন শেষ করে সব প্রাসাদে ফিরে যাবে।

পত্র ও শাখা বহুল প্রকাণ্ড একটা মাদার গাছের তলায় এসে দুই দল বিভক্ত হয়ে গেল এবং ভিন্ন ভিন্ন দিকে অগ্রসর হলো।

চারিদিকে ঝরা শুক্‌নো পাতা বনতলকে যেন একেবারে ঢেকে ফেলেছে পুরু আস্তরণেঃ পায়ের চাপে শুক্‌নো পাতা

ভেংগে গুঁড়িয়ে যায়; মুচ্ মুচ্ শব্দ তুলে, অরণ্যস্তব্ধতা ভংগ করে।

অস্পষ্ট আলো ছায়ায় বন্য গাছপালা ও লতাগুল্মগুলো যেন শত শত ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল সরীসৃপের মত মনে হয়।

আচম্‌কা বন্যজন্তুর সতর্ক পদসঞ্চার শোনা যায়।

অকারণেই গা শিউরে ওঠে!

বন্দুকে গুলী ভরে ওরা এগিয়ে চলে, হঠাৎ একটি হরিণ শিশুর সংগে ওরা মুখোমুখি হয়ে যায়।

ছোট্ট হরিণ শিশু: কি সরল ছল ছল চাউনী।

ধূর্জটি নিমেষে বন্দুক তুলে লক্ষ্য করে: বনানীর গাঢ় স্তব্ধতাকে শতধায় বিদীর্ণ করে শব্দ জাগে, গুড়ুম!...

কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, চোখের পলকে হরিণ শিশু গা ঢাকা দেয়।

'না, miss করেছি।

আবার এগিয়ে চলে: কিন্তু কোথায় শিকার, বন্দুকের গুলীর শব্দে সব আত্মগোপন করেছে।

ঘণ্টা দু'তিনের চেষ্টায় কেবল একটা বন্যশশক শিকার হয়েছে।

চলতে চলতে ওরা একটা ছোট্ট জলাশয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়: ঢালু স্যাঁত স্যাঁতে জমি, বন্য আগাছায় যেন সবুজ মখমলের মত মনে হয়।

দু'পাশ হ'তে ছায়া নিবিড় শাখা ও পত্রবহুল বৃক্ষ হ'তে নেমেছে অসংখ্য বন্যলতা অসংখ্য বাহু দিয়ে ধরিত্রীকে স্পর্শ করতে।

জলাশয়ের নিকটে নরম কাদার 'পরে অসংখ্য ছোটবড় বনচারী জন্তুর ছোটবড় পায়ের চিহ্ন!

তৃষ্ণার্ত বন্য জন্তুরা এখানে জলপান করতে আসে।

ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা গাছের নীচে দাঁড়ায়ঃ কোথায় কোন পত্রান্তরালে হড়িয়ালের ডাক শোনা যায় থেকে থেকে, বন্য আধো আলো আধো অন্ধকারে মনে হয় যেন বড় করুণ!

কোথায় অল্প দূরে ঝোপের মধ্যে একটা খস্ খস্ আওয়াজ পাওয়া গেলঃ নিশ্চয়ই কোন জন্তুর সতর্ক পদসঞ্চার।

ধূর্জটি শব্দ লক্ষ্য করে, শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

হাঁ ভুল হয়নি, একটি হরিণী তার বাচ্চাটিকে নিয়ে জলাশয়ে এসেছে জলপান করতে।

ধূর্জটি বন্দুক তুলে ধরে লক্ষ্য করে, শিকারীর প্রাণে কোন দয়ামায়া নেই; প্রশান্ত হাত ধরে বাধা দিতে যায় কিন্তু তার আগেই বন্দুক হ'তে সগর্জনে গুলি ছুটে যায়, এবং চিৎকার করে হরিণী লাফ দিয়ে জলাশয়ের মধ্যে পড়ে যায়।

সংগে সংগে বাচ্চাটাও জলে লাফিয়ে পড়ে।

শিকারের সাফল্যে উত্তেজিত ধূর্জটি ছুটে যায় জলাশয়ের দিকে।

ঢালু জমি জলাশয়ের দিকে নেমে গেছে, বন্য আগাছায় ভরা, কিন্তু ধূর্জটির কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

হরিণী গুলিবিদ্ধ হ'য়ে মারা গেছে, বাচ্চাটা তার মার ভাসমান মৃতদেহের পাশে সাঁতার দিচ্ছে প্রাণভয়ে।

প্রশান্তও এগুতে যাচ্ছিল কিন্তু আচম্‌কা একটা কালো কাপড়ে তার চোখ মুখ ঢাকা পড়ে পশ্চাৎ হ'তে।

চিৎকার করবার আগেই কে যেন সজোরে তার মুখ চেপে ধরে। নিঃসহায় প্রশান্তর সামান্য শব্দ করবারও আর উপায় থাকে না; বন্দী হয় অজানা আততায়ীর হাতে।

আক্রমণকারীরা দলে দুইজন, দলের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বলশালী সেই চোখ মুখ ঢাকা প্রশান্তকে স্বীয় স্কন্ধের 'পরে অবলীলাক্রমে তুলে নিয়ে, নিবিড় জংগলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়; দ্বিতীয় লোকটি তাকে অনুসরণ করে।

এদিকে ধূর্জটিকে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বাচ্চা হরিণটা সাঁতরে ডাংগায় উঠে বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে আত্ম গোপন করে।

মৃত হরিণটাকে কোন মতে টেনে ধূর্জটি ডাংগায় তোলে।

জলাশয়ে জল খুব বেশী নয়, বুক সমান হবে।

নিদারুণ পরিশ্রমে ধূর্জটি হাঁপাতে থাকে।

এত করেও বাচ্চাটাকে ধরা গেল না।

ধূর্জটি ডাকে: প্রশান্ত, এদিকে এসো।

কিন্তু কোন সাড়া বা প্রত্যুত্তর নেই। ও আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকে: প্রশান্ত! প্রশান্ত!

না, তবুও কোন জবাব নেই।

আবার ডাকে ও। তবুও সাড়া নেই।

বিস্মিত ধূর্জটি উঠে দাঁড়িয়ে ভাল করে চারিদিকে দৃষ্টিপাত

করে আবার ডাকে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরেঃ প্রশান্ত! কোথায় তুমি! সাড়া দিচ্ছ না কেন?

শূন্য নির্জন বনভূমি মুহূর্তে যেন সে শব্দকে গ্রাস করে নেয়।

আশ্চর্য! কোথায় গেল প্রশান্ত?

পূর্বের স্থানে ফিরে এল উৎকণ্ঠিত ধূর্জটি, কিন্তু আশে পাশে কোথাও প্রশান্তর চিহ্ন মাত্রও নেই।

ওটা কি একটা শাদা মত মাটিতে পড়ে।

নীচু হয়ে ধূর্জটি তুলে নিলঃ একটা রুমাল।

আশ্চর্য! এ যে প্রশান্তরই নাম লেখা রুমাল! প্রশান্ত গেল কোথায়?

স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রশান্তর খোঁজে ধূর্জটি ব্যস্ত হয়ে উঠে রীতিমত। কিন্তু বৃথা, কোথাও প্রশান্তর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

আশ্চর্য; এই ত কয়েক মিনিট মাত্র সে গেছে; এর মধ্যে জলজ্যান্ত ছেলেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

আর গেলই বা কোথায়! এই রুমালটাই বা এখানে পড়ে কেন?

নানা অমংগল চিন্তা মাথার মধ্যে এসে ভিড় করে।

ধূর্জটি বেশ সশংকিত হ'য়ে ওঠে।

প্রশান্ত! প্রশান্ত!

কিন্তু কোথাও প্রশান্ত নেই! এই ভয়াবহ অরণ্যের মধ্যে কি সে সত্যিই হারিয়ে গেল!

কেন সে এমনি করে অসাবধান হ'য়ে প্রশান্তকে একলা ফেলে রেখে গেল।

কোন বন্যজন্তুর কবলে পড়ল না ত ছেলেটা!

কিন্তু কোন চিৎকার বা শব্দও ত সে শোনেনি। তবে!

কি এখন করবে ও!...

প্রশান্ত কোথায় গেল!

আরো কিছুক্ষণ ধরে ভাল করে আশ পাশের জংগল পরীক্ষা করে ধূর্জটি শেষ পর্যন্ত হতাশচিত্তেই যে পথে এসেছিল সেই পথে আবার ফিরে চলল।

মাথার মধ্যে সম্ভব অসম্ভব হাজারো চিন্তা পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে।

সূর্য হেলে পড়েছে; ম্লান হয়ে আসছে তার আলো, বন্য ঠাণ্ডা অন্ধকার নেমে আসছে বাদুড়ের কালো পাখার মত বিস্তৃত হয়ে ধীরে, অতি ধীরে।

উঃ! চারিদিকে কি মৃত্যুর মত কঠিন ভয়াবহ স্তব্ধতা!

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ধূর্জটি এগিয়ে চলে।

* * *

মিঃ হুড্ অনেক আগেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগমন করেছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে প্রশান্ত ও ধূর্জটির জন্য অপেক্ষা করেও যখন তারা এসে পৌঁছাল না, তখন তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটা ইংরাজী বই পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

তার ভাগ্যে আজ একটি বুনো মুরগী মাত্র শিকার মিলেছে।

ধূর্জটির পদ শব্দে চম্‌কে চোখ তুলে ধূর্জটিকে আসতে দেখে, মিঃ হুড্ উঠে দাঁড়ান।

** আচম্‌কা চারিপাশ হতে ঘেরাও হয়ে অতর্কিত বন্দী হয়ে প্রশান্ত প্রথমটায় যেন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, এমন কি চিৎকার করে কারও সাহায্য প্রার্থনা করতেও সে যেন ভুলে গিয়েছিল।

তারপর তাকে যখন কাঁধের পরে তুলে নিয়ে হন্ হন্ করে লোকগুলো বনপথ অতিক্রম করে চলেছে, সে দু' চারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বুঝলে, এখানে বলপ্রয়োগে কোন সুবিধাই হবে না। কারণ যারা তাকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে তাদের গায়ে শক্তি প্রচুর।

চিৎকার করেও কোন ফল হবে না; মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে বেশ ভাল করে মুখটা তারা আগেই বেঁধে দিয়েছে যে।

একান্ত নিরুপায় হ'য়েই যেন প্রশান্ত আক্রমণকারীদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে ঘটনাস্রোতে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

* *

ক্লান্ত অবসন্ন ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে মিঃ হুড্ প্রশ্ন করলে; what's the matter Babu? এত দেরী হলো কেন? প্রশান্তই বা কোথায়?

নিজের অদূরদর্শিতার জন্য ধূর্জটির লজ্জার অবধি ছিল না। ম্লান বিমর্ষভাবে বললে: একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে মিঃ হুড্!

কি হয়েছে? মিঃ হুডের কণ্ঠেও যেন উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে।

সংক্ষেপে মিঃ হুডের কাছে ধূর্জটি সমগ্র ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলে যায়।

সর্বনাশ! এখন তাহলে উপায়। কোন বন্যজন্তুর কবলে প্রশান্ত পড়েনিত?

না। আমার তা মনে হয় না।

তবে?

কোন দুষ্ট লোক নিশ্চয়ই প্রশান্তকে চুরি করে নিয়ে গেছে, কারণ কোন বন্যজন্তুর দ্বারাই যদি প্রশান্ত আক্রান্ত হবে তাহলে আক্রমণের সময় নিশ্চয়ই সেই জন্তুর চিৎকার বা প্রশান্তর চিৎকার শুনতে পেতাম, আমি বেশী দূরেত যাইনি।

কিন্তু কোন দুষ্ট লোকই বা তাকে চুরি করতে যাবে কেন?

এত বড় একটা বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ঐ কিশোর বালক, তার শত্রু থাকাটা এমন কোন একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় মিঃ হুড্। যেহেতু তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলে অনায়াসেই এত বড় সম্পত্তিটা হস্তগত করা যেতে পারে।

কি তুমি বলছো মিঃ রায় আবোল তাবোল পাগলের মত! তার এ সম্পত্তির কি আর কোন ওয়ারিশন ছিল নাকি? everybody is dead, তার বংশে একমাত্র ঐ শেষ প্রশান্ত ছাড়াই কেঁউই, জীবিত নেই।

ধূর্জটি যেন এতক্ষণে বুঝতে পারে ঘটনার সংঘাতে বিচলিত হ'য়ে এমন অনেক কথাই ঝোঁকের মুখে মিঃ হুড্‌কে বলে

ফেলেছে, যা তাঁর মত চাপা ও সংযত লোকের পক্ষে কোন দিনই সম্ভবপর ছিল না।

মনে মনে ধূর্জটি বিশেষ লজ্জিত হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু এই সব রূপকথার চিন্তাকে আপাততঃ বাদ দিয়ে আমাদের প্রশান্তকে খুঁজে বের করতেই হবে, তার মামা আমার জিম্মাতেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমিই তার জন্য সম্পূর্ণ responsible, তার কোন প্রকার ভাল মন্দ হলে সর্বাগ্রে জবাবদিহী আমাকেই করতে হবে মিঃ রায়। আদালত আমাকে বাদ দিয়ে কথা বলবে না।

আইনের কারবারী মিঃ হুডের সর্বাগ্রে আইনের কথাটাই মনে পড়ে।

তুমি এক কাজ কর মিঃ রায়, তুমি রায়পুরের প্রাসাদে এখুনি ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে লোকজন পাঠিয়ে দাও, আমি আজ রাতেই তন্ন তন্ন করে এ বন খুঁজে দেখবো। I must find him out ! Any way I must find him out ! শেষের দিকে মিঃ হুডের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উত্তেজনার যেন আভাস পাওয়া গেল।

ধূর্জটি সত্যিই নিজেকে বড় ক্লান্ত বোধ করছিল ; মিঃ হুডের কথামত রায়পুর প্রাসাদে তখুনি ফিরে আসবার জন্য প্রস্তুত হলো।

বন্য অন্ধকার চারিপাশে ঘন হ'য়ে বাদুড়ের কালো ডানার মত যেন ছড়িয়ে আসছে। নিবিড় অরণ্যানীর সর্বাংগকে যেন

এখুনি অন্ধকার এসে বেষ্টন করে ফেলবে! চারিদিকে কালো অন্ধকার ঢেকে দেবে!

অদ্ভুত সব বন্য শব্দ সেই অন্ধকারে জেগে উঠ্‌বে; রাত্রিচর হিংস্র পশুর নিঃশব্দ সতর্ক পদ সঞ্চারে হয়ে উঠ্‌বে সব ভয়ংকর; বন্যপশুর রক্তে লাগবে দোলা।

ক্ষুধার্ত লেলিহান হয়ে উঠ্‌বে তারা শিকারে অন্বেষণে!

পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সুরু করবে হিংস্র কামড়া কামড়ি, সবল দুর্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি ছিঁড়ে পরমানন্দে করবে রক্ত পান!

মিঃ হুডের লাল মুখটা যেন উত্তেজনায় ভয়ংকর থম্ থমে হ'য়ে উঠেছে।

হাতের সুদৃঢ় পেশীগুলো স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

শক্ত মুষ্টিতে সে গুলিভরা রাইফেলের কুঁদোটা চেপে ধরে!

নীল চোখের তারা দু'টো যেন ক্রোধের আগুনে নীল আগুন ছড়াতে থাকে।

* *

বহুপথ অতিক্রম করে বহনকারীরা প্রশান্তকে নিয়ে জংগল পার হ'য়ে শালবনীর পায়ে চলার রাস্তায় এসে পড়ে।

চারিদিকে তখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে; কালো অন্ধকার।

একজনের সংগে একটা পাঁচ সেলের টর্চবাতি ছিল, সেই বাতির আলোয় ওরা এগিয়ে চলে।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ওরা এসে নৃসিংহগ্রামে হাজির হয়।

নৃসিংহগ্রাম এর মধ্যেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে নিশুতি রাতের মত।

সেই পাতাল ঘরের মধ্যে এনে ওরা প্রশান্তকে নামায়।

পূর্ববর্ণিত রাজাবাহাদুর আগে হতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর ছিল তাঁর দক্ষিণ হস্ত ভবানী প্রসাদ।

ভবানী প্রসাদ, লোকটা সত্যিই সুপুরুষ।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের রং। টিকোল নাসা, টানাটানা দু'টো চোখ কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যেন যত প্রকারের শয়তানী এসে বাসা বেঁধেছে।

দৃষ্টি সর্বদাই চঞ্চল।

দীর্ঘ লম্বা পেশল চেহারা।

দেখলেই মনে হয় লোকটা গায়েও শক্তি রাখে প্রচুর।

রাজাবাহাদুর আড়ালেই আত্মগোপন করে থাকেন।

ভবানীর নীরব ইংগিতে ওরা প্রশান্তর বন্ধন খুলে দেয়।

মুহূর্তে প্রশান্ত উঠে দাঁড়ায়ঃ কে তোমরা, কেন তোমরা আমাকে এমনি করে ধরে নিয়ে এলে?

ব্যাঘ্র শাবক ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ায়।

ভবানী প্রসাদ হাঃ হাঃ করে উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে।

তার সেই প্রচণ্ড হাসির শব্দ রুদ্ধ কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ভয়ংকর প্রতিধ্বনি জাগায়।

শোন হে ছোকরা! ভবানী প্রসাদের কথার মাঝখানেই তীব্রভাবে প্রশান্ত বলে ওঠেঃ ভদ্র ভাষায় কথায় বলতে জানেন না! আমার নাম প্রশান্ত কুমার রায়।

প্রশান্ত কুমার রায় ! তা বেশ ! কিন্তু আমারও নাম ভবানী প্রসাদ অধিকারী।

আমাকে এখুনি এখান থেকে বের করে দাও, আমি বাসায় যাবো।

আপাততঃ বাসা তোমার কিছু দিনের জন্য এখানেই, বুঝলে হে !

আমি এখানে এক মুহূর্ত'ও থাকবো না।

থাকবে না ! কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে যে চাঁদ !

আবার অসভ্যের মত কথা বলছো !

থাম হে ছোক্‌রা ; গলা টিপলে এখনো মার বুকের দুধ বের হবে, গর্জন দেখো না। বিষ নেই, তায় কালো পানা চক্কর।

প্রশান্ত এবারে দরজার দিকে ছুটে যায়।

অন্য দু'জনে প্রশান্তকে বাধা দেয়, প্রশান্তও হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায় ঃ ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও, আমি যাবো, যাবো !...

সহসা ভবানী প্রসাদ এগিয়ে এসে প্রশান্তর দু'হাত ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনী দিয়ে এক পাশে ঠেলে দেয়, তার পরই বিষ্টুর দিকে ফিরে চেয়ে বলে ঃ বিষ্টু চরণ, যাও উপরের ঘরে, আমার দেওয়ালে টাংগানো আছে হাংগর মাছের হান্টারটা। পাগলা কুকুরকে চাবুক পিটিয়ে সায়েস্তা করতে আমিও জানি।

প্রশান্ত থম্‌কে দাঁড়ায় ঃ তুমি ! তুমি আমাকে চাবুক মারবে !

প্রয়োজন হ'লে চাবকিয়ে পিঠের চামড়া পর্যন্ত তুলে দেবো।

কিন্তু আমি তোমার কি করেছি, এখানে আমাকে আট্‌কে রাখবে কেন ?

বেশী দিন নয়, মাত্র কয়টা দিন, তারপর ছেড়ে দেবো, গোলমাল চেঁচামেচি করো না। যা চাও সব পাবে, আর তা না হলে এই অন্ধকূপের মধ্যে বন্দী করে শুকিয়ে ইঁদুরের মত না খেতে দিয়ে উপোষ করিয়ে মারব।

আমি চেঁচাবো…

হাঃ হাঃ করে ভবানী প্রসাদ উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠেঃ পাতাল ঘরের এ দেওয়াল ভেদ করে কেউ তোমার চিৎকার শুনতে পাবে না চাঁদ ! যত খুসী চেঁচাও, গলা ফাটিয়ে চেঁচাও।

আমাকে তোমরা এই ঘরেই তাহলে বন্দী করে রাখবে ?

হাঁ !

প্রশান্ত স্থানুর মত নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভবানী প্রসাদের নির্দেশমত একটা লণ্ঠনবাতি জ্বালিয়ে রেখে একাকী ওরা প্রশান্তকে সেই পাতাল ঘরের মধ্যে আটকে রেখে সকলে বের হ'য়ে যায়।

নিয়তি কি নির্মম ! প্রশান্তরই প্রপিতামহের তৈরী অন্ধকূপে বন্দী হ'য়ে আসতে হলো আজ তাকেও।

এও বোধ হয় বংশগত মহাপাপেরই ফল।

* *

নিষ্ফল আক্রোশে যখন প্রশান্ত বন্দী শার্দুলের মত নৃসিংহ গ্রামের রাজ প্রাসাদের পাতাল কক্ষে নিরুপায় পায়চারী করছে,

মিঃ হুড্ তখন তার লোকজনদের নিয়ে বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে সমস্ত জংগল তোল পাড় করে ফিরছেন।

সামান্য মাত্র শব্দ হলেই ঘন ঘন আক্রোশে রাইফেল চালাচ্ছেন।

গুলির শব্দে রাত্রির নিঃস্তব্ধ বনানী থেকে থেকে চমকিত হ'য়ে ওঠে।

প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরে সমস্ত জংগলটা তোলপাড় করে ক্লান্ত অবসন্ন মিঃ হুড্ এক সময় জংগলের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

পূর্বাকাশের প্রান্ত ঘেঁষে তখন প্রথম ভোরের আলো ছায়ার লুকোচুরি চলেছে।

স্কন্ধে ঝোলান ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে পান করেন মিঃ হুড্।

আশ্চর্য! ছেলেটা তবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

কিন্তু মিঃ রায় ওকথা তখন বললেন কেন?

তবে কি সত্যিই এর মধ্যে কোন দুষ্ট লোকের কারসাজী আছে!

তাই বা কি করে হবে!

কেউত ওদের বংশে আর বেঁচে নেই। কেই বা ওর মৃত্যুতে লাভবান হবে।

—এগার— —আবার পাতাল ঘরে—

আর সেই রাত্রে প্রাসাদে।

শম্ভু যখন প্রত্যাগত ক্লান্ত ধূর্জটির মুখে প্রশান্তর অদৃশ্য হওয়ার সংবাদটা পেল, প্রথমটায় ও [illegible] একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যা সে এ কয়দিন ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত তাই ঘট্‌লো।

* *

আর একজনের কানেও এ দুঃসংবাদ যেতে দেরী হলো না; সেই ছায়ামূর্ত্তি।

শম্ভু গুম্ হ'য়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে ছিল, কার সতর্ক পায়ের শব্দে ও চম্‌কে ওঠে: কে?

শম্ভু আমি! কিন্তু এসব কি শুনছি, একি সত্যি?

হাঁ বাবু, সত্যি!…

এতক্ষণে যেন শম্ভুর সংযমের বাঁধটা ভেংগে যায়; সে নিরুপায় কান্নায় একেবারে ভেংগে পড়ে।

ছায়ামূর্ত্তি কিছুক্ষণ যেন গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল পাথরের মত, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে: এ আমি হতে দেবো না শম্ভু! যেমন করেই হোক তাকে আমি খুঁজে বের করবোই শম্ভু! আমার শেষ আশার আলোটি এমনি করে নির্বাপিত হ'তে আমি দেবো না, না, না, না, কিছুতেই না; আমি চল্লাম শম্ভু!

রাজাবাবু!

চকিতে ছায়ামূর্ত্তি শম্ভুর ডাকে ফিরে দাঁড়ায় : রাজাবাবুর মৃত্যু হয়েছে শম্ভু! ও নামে আর ডেকো না! তারা হয়ত আমার বাছাকে কত কষ্টই না দিচ্ছে। তার গায়ে একটু আঘাত করলেও আমি কাউকে ক্ষমা করবো না। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে এর প্রতিশোধ নেবো। রাজা সুবিনয় মল্লিকের প্রতিহিংসা বড কঠোর, বড় ভয়ংকর।

অন্ধকারে রাজা সুবিনয় মল্লিক অদৃশ্য হয়ে যায়।

ক্রমে তার পায়ের শব্দও মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

গুপ্তদ্বার পথে প্রাসাদ হ'তে নিক্রান্ত হয়ে রাজা সুবিনয় মল্লিক হন্ হন্ করে সাঁওতাল পল্লীর পথ ধরে এগিয়ে চলে।

মনের মধ্যে যেন ঝড় জেগেছে।

সব কিছু ওলট পালট হ'য়ে যাচ্ছে।

দেহের প্রতি লোমকূপে যেন আগুনের জ্বালা।

মাথার পরে রাত্রির নিঃসংগ আকাশ থম্ থম্ করছে, পশ্চিমাকাশে হয়েছে পূঞ্জ পূঞ্জ কালো মেঘের সঞ্চার।

বৃষ্টি হবে হয়ত।

অসহ্য গুমোট গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশ মাত্র নেই কোথাও।

কে জানে ঝড় উঠ্‌বে কিনা! উঠুক ঝড়! উঠুক!

* *

নৃসিংহ গ্রামের রাজ প্রাসাদের দ্বিতলের একটি কক্ষ।

ভবানী প্রসাদ, রাজা বাহাদুর, বিষ্টু চরণ গুপা।

বিষ্টু বলছিল: উঃ ছেলেটার কি গোঁ, খাবার কিছুতেই স্পর্শ করলে না।

কৈলাস : হাজার হলেও জাত সাপের বাচ্ছা ত, ছোবল দেওয়াই যে ধর্ম !

দেখবেন রাজাবাহাদুর ওকে নিয়ে বেগ পেতে হবে আপনার : বিষ্টু বলে।

চাবুক পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবো দু'দিনেই : সদম্ভে ভবানী প্রসাদ বলে।

কিন্তু সে সব হবেখন ! বিষ্টু চরণ্ কৈলাস্ তোমাদের কাজ হ'য়ে গেছে, এবারে তোমরা যেতে পার। ভবানী ওদের পাওনা গণ্ডা সব গিয়ে মিটিয়ে দাও।

চলহে : ভবানী বলে ওদের দিকে চেয়ে।

আচ্ছা তবে চললাম বাবু, গরীবদের যেন ভুলবেন না।

ওরা ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় ভবানীর পিছু পিছু।

হিংস্র পশু যেমন শিকারকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে এনে পরিতৃপ্ত হাসি হাসে, রাজাবাহাদুরের বিকশিত ওষ্ঠ প্রান্তেও ঠিক তেমনি হাসির একটা মৃদু আভাস জেগেই মিলিয়ে যায়, ওদের ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হবার সংগে সংগেই।

বিষ্টু চরণ খ্যাপাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে, ভবানী প্রসাদের সংগে সংগে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। আনকোরা নোটের একটা তাড়া জামার পকেট হ'তে বের করে, বিষ্টুর সামনে ভবানী প্রসাদ এগিয়ে ধরল : এতে আরো চার হাজার টাকা আছে বিষ্টু, এই নাও !...

লোভে বিষ্টুর চোখের তারা দু'টো জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে, লোলুপাতুর দক্ষিণ হস্তটা সে এগিয়ে দেয়; কিন্তু ঠিক সেই

মুহূর্তেই চোখের পলকে ক্ষিপ্র হস্তে কোমর থেকে তীক্ষ্ণ ধারালো একখানা ছোরা বের করে ভবানীপ্রসাদ বিষ্টুর বক্ষে সমূলে বসিয়ে দেয়।

একটা ভয়চকিত আর্ত চিৎকার করে হতভাগ্য বিষ্টু মেঝের পরে টলে পড়ে যায়।

ক্রুদ্ধ হিংস্র হায়নার মত একটা বন্য হাসি ভবানীপ্রসাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে পৈশাচিক ভাবে : টাকা নেবে ইনাম্।...

রক্তে বিষ্টুর জামা কাপড় তখন সিক্ত হয়ে উঠেছে, ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে ও বলে : বিশ্বাসঘাতক। শয়তান!

ক্ষ্যাপা অত্যন্ত সেঁয়ানা, সে বাইরের দরজার গোড়াতেই ঠিক ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, বিষ্টুকে ঠিক কত টাকা দেওয়া হয় গোপনে দেখবার জন্য।

কিন্তু টাকার পুরস্কারের বদলে যখন ও দেখ্‌লে বিষ্টু ছোরাবিদ্ধ হয়ে মাটি নিল, ও একটা অস্ফুট ভয় মিশ্রিত শব্দ করে দু' পা পিছিয়ে এসেই তড়িৎবেগে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। সে বুঝতে পেরেছিল পারিতোষিকটা ঠিক মনের মত হবে না।

নিদারুণ রক্তস্রাবে বিষ্টু শীঘ্রই অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, একটা ঘন কালো পর্দা ধীরে ধীরে তার দৃষ্টির পরে নেমে আসে। ও স্পষ্টই বুঝতে পারে, মৃত্যুর আব বড় বেশী দেরী নেই। মৃত্যু আসছে তার ঘন কালোছায়া বিস্তার করে।

স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, সর্বাংগ শিথিল, অনুভূতিও শেষ হয়ে আসছে : শয়তান।

হাঃ হাঃ করে ভবানীপ্রসাদ হেসে ওঠে : ঠুন্‌কো কাজ

কখনো করেনা হে ভবানীপ্রসাদ! পাপ সে করে বটে, তবে স্বাক্ষী রেখে কোন দিনই করে না। He is not a fool!

কিন্তু···হঠাৎ বোধ হয়, বাইরে অপেক্ষমান ন্যাপার কথা ভবানীপ্রসাদের মনে পড়ে যায়। ভবানীপ্রসাদ চট্ করে কাপড়ের তল থেকে রিভলভারটা বের করে ঘরের বাইরে যায়। কিন্তু কোথায় ন্যাপা! সে বহু আগেই বিষ্টু চরণের পরিণতি দেখে অন্ধকারে মিশিয়ে গেছে। সে ত মূর্খ নয়।

বৃথাই ভবানীপ্রসাদ আলো ফেলে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করে, কিন্তু কোথাও ন্যাপার সন্ধান মেলে না।

ভবানীপ্রসাদ কক্ষের মধ্যে ফিরে এলো; রক্তাপ্লুত মেঝের পরে হতভাগ্য বিষ্টু চরণের মৃত দেহটা অসাড় নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে আছে মাত্র।

লোভের ও পাপের চরমদণ্ড সে মেনে নিয়ে তার জীবন দিয়ে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে।

ভবানীপ্রসাদ যখন ফিরে এলো রাজাবাহাদুরের ঘরে, রাজাবাহাদুর তখনও ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে।

ওরা চলে গেল!

হাঁ!···গেল।

সহসা ঘরের লণ্ঠনের আলোয় ভবানীপ্রসাদের জামায় রক্তের দাগ দেখে সভয়ে রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করে: ওকি ভবানী! তোমার জামায় লাল দাগ কিসের? কি, ব্যাপার কি?

লাল দাগ না ওটা রাজাবাহাদুর, রক্ত।

রক্ত!

হাঁ। বিষ্টু চরণের রক্ত !

সে কি !

হাঁ, শত্রুর শেষ রাখতে নেই শাস্ত্রে বলে, একেবারে শেষ ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

সেকি ! খুন করেছো !

কেন, অবাক হচ্ছো কেন ? দুষ্কর্মের সাক্ষী রাখতে নাই।

তাই বলে লোকটাকে তুমি খুন করলে ভবানী ?

খুব অন্যায় করেছি কি ? কিন্তু ব্যাপার কি বলত ? ভূতের মুখে যেন হরিনাম শুনছি It's Strange !

আর ন্যাপা ?

না, সেটাকে শেষ করতে পারিনি, তার আগেই বেটা গা ঢাকা দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত লোকটাকে খুন করলে ভবানীপ্রসাদ ! টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিলেই হতো।

তাতে টাকাও যেত, ভয়ও থাকত, তা ছাড়া এর পর রক্ত চোষার মত সে সুযোগ পেলেই তোমাকে black mail করে শোষণ করত। তার চাইতে কি এই ভাল হলো না ? একেবারে নিশ্চিন্ত। No worries left behind !

কিন্তু··· ।

রাজা হ'তে চলেছো, রক্ত তিলক না হলে রাজার যোগ্য অভিষেক কি হয় !···তা ছাড়া প্রশান্তকে ত খুন করবার জন্যই ধরে এনেছো ! কি বলো, আননি ?

প্রশান্ত সম্পর্কে এখনো আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে

পারিনি ভবানীপ্রসাদ। যত দূর-সম্পর্কীয়ই হোক, ক্ষীণ একটা রক্তের সম্পর্ক তার সংগে আমার আছে। এ ভাবে গদীতে বসতে, মন যেন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

ভীরু কাপুরুষ! এতদূর এগিয়ে এসে কি সব মেয়ে মানুষের মত দুর্বলতা প্রকাশ করছো! ছিঃ shake off all these stupid sentiments!

অভিশপ্ত এ রায়পুরের গদী ভবানীপ্রসাদ!...তুমি জাননা!

জোরে শংখ বাজিয়ে সে অভিশাপকে আমরা দূর করবো। কণ্টক রেখে গদীতে বসা হবে না। পরবর্তী কালে ঐ কণ্টকই হয়ত তোমাকে একদিন ক্ষত বিক্ষত করতো। তা ছাড়া, জাত সাপের বাচ্চা সুযোগ পেলেই মৃত্যু ছোবল দেবে।

ঐ কিশোর বালককে তাই বলে আমি কিছুতেই খুন করতে পারবো না ভবানীপ্রসাদ। না...না!

যা করবার আমিই করবো, ও নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। You keep silent!

কিন্তু ন্যাপা যে পালিয়ে গেল, ও যদি এবারে আমাদের প্ল্যান সব ও পক্ষে গিয়ে প্রকাশ করে ভেস্তে দেয়!

সেটা অবিশ্যি ভাববার কথা বটে। ভবানীপ্রসাদও যেন সত্যিই একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে!

—বারো— —পরিচয়—

সাঁওতাল পল্লীতে সাঁওতাল সর্দারে মন্নুর ঘর।

মন্নু সর্দার বলছিল, কিন্তু তোর কথাতে আমি কিছুই বুঝে উঠতে লারছি রে রাজা। বেটাকে কে লুঠ করে নিয়ে যেতে পারে ?

তবে সে জংগলের মধ্যে থেকে কোথায় গেল ?

তুই ভাবনায় ফেললি রাজা! এখোন কি করি বলত ?

কাল আর একবার ভাল করে জংগলটা খুঁজে দেখতে হবে মন্নু! তোর লোকজন সব পাঠিয়ে দিবি।

দেবো!

পরের দিন রাত্রে।

কয়েক দিনের জন্য রায়পুর প্রাসাদে যে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল প্রশান্তর আগমনে, হঠাৎ যেন সেখানে আবার তার অতর্কিত তিরোধানে মৃত্যু নিঃশব্দতা এসেছে নেমে।

শম্ভু যেন একদিনেই একেবারে ভেংগে পড়েছে, ঝড়ে যেন একটা প্রকাণ্ড বহু পুরাতন গাছকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে।

রাতারাতি যেন শম্ভুর একেবারে দশটা বছর বয়স এগিয়ে গেছে।

ধূর্জটি তার নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে বসে চিন্তা করছিল, কিন্তু

কোন সূত্রই ধরতে পারছে না। কি ভাবে কোন পথ ধরে এখন অগ্রসর হলে যে এই সমস্যার একটা মীমাংসা হ'তে পারে কিছুতেই যেন ও বুঝে উঠ্‌তে পারছে না।

শম্ভু এসে নিঃশব্দে ছায়ার মত ঘরে প্রবেশ করল, রায়বাবু!

ধূর্জটি চম্‌কে ওঠে: কে? ও শম্ভু! কি খবর?

প্রশান্ত দাদাকে কি আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, কান্নায় বেচারীর স্বর যেন ভেংগে যায়।

বোস শম্ভু!

শম্ভু মাটির পরেই বসে পড়ে।

শম্ভু, তোমার সংগে আমার কয়েকটা কথা আছে।

বলুন! কিন্তু তারও আগে তোমাকে আমার সত্যকারের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। আমার আসল নাম ধূর্জটি নয়, কিরীটি রায়।...

তবে কি, বিস্ময়ে শম্ভু যেন উঠে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ বোস, উত্তেজিত হয়োনা, আমি সেই কিরীটি রায়, যে সেবারে এখানে ইনেস্‌পেক্টারের ছদ্মবেশে এসে দারোগা সাহেবের কুঠিতে উঠেছিলাম, এবং সুহাস বাবুকে দ্বীপান্তরের দণ্ড হ'তে বাঁচিয়েছিলাম।

কিন্তু—

আশ্চর্য হচ্ছো নিশ্চয়ই, এখানে আবার কেন আমি এলাম না? ধরতে পার কতকটা ঘটনাচক্রে, কতকটা অদৃশ্য নিয়তির টানে—এখানে আবার এসে আমি হাজির হয়েছি।

তোমাদের রায়পুরের প্রাসাদ সম্পর্কে কিরীটি বলতে থাকে : কিছুদিন আগে যে অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ডের কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছিল, সেটাই এবারে আমাকে বিশেষ ভাবে কৌতূহলী করে তোলে, কিন্তু সেটাই এবারে আবার এখানে আমার আসবার একমাত্র কারণ নয়।

তবে ?

কিছু কাল আগে আসানসোলে যে বিধু নামে একটি লোক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল, এবং পরে যার মৃতদেহ তল্লাসী করতে গিয়ে কয়েকটি চিঠি পত্রের মধ্যে পলাতক রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের পরিচয় পাওয়া যায়, সে কথা তুমি জান কিনা আমি জানি না।

জানি।

তখন থেকেই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে।

কি সন্দেহ ?

আসলে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ বিধু মোটেই রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক নন। তবে হয়ত, রাজাবাহাদুরের সংগে লোকটার যোগাযোগ ছিল, এবং রাজাবাহাদুর আসলে লোকটার মৃত্যুই চেয়েছিলেন।

কেন ?

রাজাবাহাদুর তা'হলে ঐ মৃত ব্যক্তির পরিচয়ে অনায়াসেই বেঁচেও আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন, তাছাড়া তার আরো একটা কারণ ছিল, আমি স্বচক্ষে অকুস্থানে গিয়ে মৃতদেহ দেখেছিলাম নিজে গিয়ে।

তবে সে লোকটা কে ?

যেই হোক, রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক সে মোটেই নয়, আমার স্থির বিশ্বাস তোমাদের সেই পলাতক রাজাবাহাদুর এখনও জীবিত। এবং আমার স্থির ধারণা তাঁর বর্তমান উপস্থিতি কোথায় তা তোমার অগোচর নয়।

আমি জানি ? বিস্মিত কণ্ঠে শম্ভু বলে।

হাঁ, তুমি জান। শোন শম্ভু, প্রশান্ত প্রাণে বেঁচে থাক, এবং সুস্থদেহে এবং তুমিও চাও তাকে আবার আমরা উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তুমিও নিশ্চয়ই জান আমি বিশ্বাস করি না প্রশান্ত জংগলের মধ্যে কোন বন্য জন্তুর কবলে গেছে। এ কোন শয়তানের কারসাজী !

আমারও তাই মনে হয় ঃ

তবে তুমি আমাকে সাহার্য্য কর শম্ভু।

আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন ?

তুমি যা যা জান, সব আগাগোড়া কিছুমাত্র না গোপন করে আমার কাছে খুলে বল।

আপনি যা সন্দেহ করছেন কিরীটি বাবু, তা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি আপনাকে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কথা আমি কিছুই জানি না। সহসা এতক্ষণে যেন কিরীটির গলার স্বর সম্পূর্ণ বদলে যায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে ডাকে ঃ শম্ভু ! আমার নাম কিরীটি রায়, এখনো তুমি যা জান সব আমাকে খুলে বল !

আমি।

তুমি জান নিশ্চয়ই তোমার রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক কোথায় এখন আত্মগোপন করে আছেন। এখনও অনুরোধ করছি। তুমি বল তিনি কোথায় ?

এ আপনি কি বলছেন কিরীটি বাবু ? আপনি কি বলতে চান, রাজাবাহাদুরই তাঁর নিজের সন্তানকে হত্যা করবেন বলে চুরি করে নিয়ে গেছেন ? তাও কি কখনো সম্ভব হয়, কোন বাপ কি কখনো তার নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে, আপনিই বলুন ?

কিরীটির ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্তের জন্য একটা কঠিন হাসি জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়। বলে, পারে কি না সে আলোচনা এখন আপাতত মুলতুবী থাক শম্ভু ! আমি শুধু তোমার কাছে জানতে চাইছি, তোমাদের পলাতক রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক এখন বর্তমানে কোথায় ? তাঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

আমি জানি না কিরীটি বাবু, আর জানলেও বলতাম না।

বলবে না ?

না।

বলবে না ?

না।

শম্ভু এরপর ধীর পদে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যাবার জন্য উঠে খোলা দরজার দিকে অগ্রসর হয়। শম্ভুর গমন পথের দিকে চেয়ে, শম্ভুকে লক্ষ্য করে তীব্র কঠোর কণ্ঠে কিরীটি বলে : তুমি না বললেও আমি জানাবো শম্ভু ! কিরীটি রায়ের চোখে

সে ধুলো দিতে পারবে না। দেখা হ'লে এই কথাই তোমাদের রাজাবাহাদুরকে বলে দিও।

বেশ। শম্ভু ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

শম্ভু ঘর হ'তে বের হয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই একজন ভৃত্য এসে কিরীটিকে জানাল, মিঃ হুড্ তাকে এখনি একবার দেখা করতে বলেছেন। তার সংগে, কি সব জরুরী কথা আছে।

মিঃ হুড্ তার প্রাইভেট্ চেম্বারে পিছন দিকে হাত রেখে অস্থির পদে পায়চারী করছিলেন, একটা লোক অল্প দূরে চুপ্ চাপ দাঁড়িয়ে, লোকটা আর কেউ নয়, সেই পলাতক গ্যাপা।

মিঃ হুডের মুখে চিন্তার কালো ছায়া।

কিরীটির পদশব্দে মিঃ হুড্ সামনের দিকে মুখ তুলে তাকালেন: রায়?

তুমি আমাকে ডেকেছো মিঃ হুড্?

হাঁ। It is a strange story!

ও লোকটা কে? কিরীটি মিঃ হুডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

সেই জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, after all 'your conclusion is true Mr. Roy।

কিরীটি মিঃ হুডের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করে, ব্যাপারটা যেন ও ঠিক ভাল মত বুঝে উঠ্তে পারে না।

এই লোকটা, নৃসিংহগ্রাম থেকেই আসছে, এবং ওই প্রশান্তের খোঁজ এনেছে, The boy has been Kidnapped. কতকগুলো বদমাস্ লোক জংগলের ভিতর হতে প্রশান্তকে

গায়েব করে নিয়ে গেছে। সে এখন নৃসিংহ গ্রামের পাতাল কক্ষে বন্দী। The poor boy! I am very sorry for him! মিঃ হুড্ একে একে সংক্ষেপে স্যাপার মুখে শোনা কাহিনীর বর্ণনা করে যান কিরীটিকে। তারপর আবার বলেন, এই লোকটাই এবং এর সংগী প্রশান্তকে তোমার absenceয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল জংগল থেকে টাকার লোভে। কিন্তু তারা এতদূর শয়তান যে, এর সংগীকে টাকা দেওয়ার নাম করে অতর্কিতে Stab করে ছোরা দিয়ে, লোকটা সেখানেই মারা গেছে। তারা নাকি Plan করেছে প্রশান্তকেও খুন করে ফেলবে। Now tell me what to do?

কিরীটি কিন্তু মিঃ হুডের সব কথা শুনেও বিস্মিত হয় নি, কারণ সে ঐ রকমই একটা কিছু প্রথম থেকেই অনুমান করেছিল।

আমি এখনি থানায় সংবাদ পাঠাচ্ছি, পুলিশ নিয়ে গিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে প্রশান্তকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে; what do you think?

একটা কিছু করতে হবেই আমাদের, কিন্তু ভেবে চিন্তে যা করবার করতে হবে, নচেৎ তারা জানতে পারলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। তাছাড়া একটা কথা ভুলো না, তারা জানে ঐ লোকটা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছে এবং ও যে আমাদের এখানে এসে তাদের পরে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারে সে ও তারা কি ভাবেনি মনে করো?

এবং নিশ্চয়ই তার জন্য তারা প্রস্তুতই থাকবে ঃ কিরীটি প্রত্যুত্তরে বলে।

তবে ?

ব্যস্ত হয়ো না, আগে আমি ভাল করে আর একবার লোকটার সংগে কথাবার্তা বলে দেখি, তারপর আমরা ভেবে দেখবো which is the best.

O. K, কিন্তু মিঃ রায় you must hurry up ! সময় খুব অল্প আমাদের হাতে।

কিরীটি মৃদু হাসে।

:

—তের— —সংকল্প—

তোমার নাম ন্যাপা ? কিরীটি প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে।

তুমি জান, যে কাজ আজ তুমি করতে এসেছো, ওরা ধরতে পারলে একেবারে তোমাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে ?

খুব জানি স্যার, খুব জানি! কচি খোকাটি ত' আর নই। দু'কুড়ির বেশী বয়স হলো ঃ কিরীটির প্রশ্নের জবাবে ন্যাপা বলে।

তোমাদের দলের সর্দারের আসল নাম বা পরিচয়টা জান ?

লোকটার আসল নাম বা পরিচয় আমি জানি না স্যার, তবে তাকে রাজাবাহাদুর বলেই জানি! এবং দলের সবাই তাকে ঐ নামেই জানে।

কিরীটি যেন গ্যাপার কথাটা শুনে বেশ চম্‌কেই ওঠে: রাজাবাহাদুর ?

আজ্ঞে হাঁ !···প্রশান্তকে একবার কোনমতে সরাতে পারলে শুনেছি সেই গদীতে বসবে !

এ আবার বলে কি ? এ যে সব হেঁয়ালীর মতই মনে হচ্ছে। রাজাবাহাদুর, অথচ প্রশান্তকে সরাতে পারলে সেই গদীতে বসবে।

লোকটা দেখতে কেমন বলত ?

গ্যাপা যে বিবৃতি দেয়, তার চেহারার সংগে পলাতক রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকের চেহারা হুবুহু না মিললেও কিছুটা যেন মেলে, তবে লোকটা ছদ্মবেশেই আছে নিশ্চয়। কিরীটি আবার প্রশ্ন করে: তোমাদের দলে আর কে কে আছে গ্যাপা ?

বিষ্টু চরণ, আমি, কৈলাস ও ভবানীপ্রসাদ। ঐ ভবানী প্রসাদই বিষ্টুকে খুন করেছে স্যার !

ভবানীপ্রসাদকে আগে তুমি চিনতে ?

না, নৃসিংহ গ্রামে গিয়েই এবারে ওকে প্রথম দেখলাম।

কি রকম দেখতে লোকটা ?

কন্দর্পের মত দেখতে বললেও ভুল হয় না স্যার।

তুমি আপাততঃ এখানেই থাকো, কোথাও যেয়ো না। বুঝলে ?

কিন্তু বাবু পুলিশের হাত থেকে কিন্তু আমাকে বাঁচাতে হবে।

পুলিশকেও ভয় কর নাকি হ্যাপা ?

ও জাতটাকে ভয় করে না এমন লোক জগতে কে আছে স্যার ?

আচ্ছা সে হবে খন!

*  *  *

রাজাবাহাদুর ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে শয্যার পরে উঠে বসে ঃ

ব্যাপার কি ?

সামনেই দাঁড়িয়ে ভবানীপ্রসাদ।

বহু সাঁওতাল এসে প্রাসাদ ঘেরাও করেছে !

সেকি !

হুঁ, ব্যাপার যেন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

রাজাবাহাদুর তাড়াতাড়ি ঘরের সংলগ্ন খোলা ছাদের প্রাচীরের সামনে ছুটে এল ; অন্ধকার রাত্রি, বোধ করি রাত্রি তিনটে হবে।

প্রায় শ' দেড়েক সাঁওতাল, লাঠি সোটা, তীর ধনুক হাতে, কালো কুচ্‌কুচে পাথরে গড়া যেন সব দেহ, হাতে মশাল।

মশালের লাল আলোয়, যেন ওদের প্রেতের মতই মনে হয়।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

ব্যাপার কি, এত সাঁওতাল, এরা কি চায় ভবানীপ্রসাদ ?

একটা কিছু চায় বৈকি ! এবং ওদের হাব ভাব দেখে এটা অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মংগল নিশ্চয়ই চায় না।

তবে ?

সেটা জানতে পারলেত' কথাই ছিল না।

আমাদের আক্রমণ করবে নাকি ?

আক্রমণ করবে কিনা তা ওরাই জানে। তবে দেখে ওদের যে অহিংসার বাণী শোনাতে এসেছে বলে ত' মনে হচ্ছে না।

ঠাট্টা রাখ ভবানীপ্রসাদ! বিপদের এ বেড়াজালের মধ্যে তোমার এধরণের ঠাট্টা ভাল লাগছে না সত্যি বলছি।

ভয় পেলে মহীতোষ ?

ভয়!

হাঁ! সাঁতার জাননা অথচ জলে ঝাঁপ দিয়েছো, এখন পেটে যদি কিছু জল ঢোকেই, তবে হজম করতে হবে বৈ কি!

কিন্তু এ জঙ্গের মধ্যে টেনে এনে আমাকে নামিয়েছিল কে শুনি ?

এ একেবারে ছেলেমানুষের মত কথা হলো, তুমিত' আর কচি খোকাটি নও মহীতোষ, যে তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জলে টেনে এনে নামিয়েছি। শোন মহীতোষ, রত্ন সিংহাসনের পথ চিরদিনই কণ্টকে ভরা, সোনার চাক্তি কি এমনি মেলে ?

তোমার ওসব 'সারমন্' এখন শিকেয় তুলে রাখ দেখি। কি করবে এখন বল ?

বাইরে একটা মৃদু গোলমালের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল: যেন বহুদূরে মক্ষিকার চাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।

দেখা গেল, মাঝখানে বুড়ো গোছের একজন সাঁওতাল,

আর দু'পাশে দু'জন সাঁওতাল, তাদের একজনের হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল।

ওরা এগিয়ে আসছে।

হামাদের রাজা বাবুকে ছেড়ে দে, এই! তোরা কে কোথায় আছিস্? বুড়ো সর্দার লোকটা চিৎকার করে বলে।

সভয়ে ভবানীপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মহীতোষ প্রশ্ন করে, কি বলছে ও লোকটা?

যা ভেবেছিলাম তাই। ওরা টের পেয়েছে যে প্রশান্তকে আমরা এখানে এনে আটকে রেখেছি।

তবে এখন উপায়?

উপায়!· ·ভবানীপ্রসাদকে বেশ চিন্তিত দেখায়।

ভবানী, ওসব হাংগামায় আর কাজ নেই, ছেলেটাকে ছেড়েই না হয় দাও!···

কি বললে? ভবানীপ্রসাদ রুক্ষভাবে ফিরে দাঁড়ায়, তার দু'চোখের তারায় যেন তখনও আগুন জ্বলছে।

ছেড়ে দাও ছেলেটাকে।

তা হয় না! পাশার দান ফেলেছি, হয় এস্পার না হয় উস্পার।···No compromise.

বুঝতে পারছো না, এতগুলো বুনো অশিক্ষিত জংগলী যদি ক্ষেপে যায়, তাহলে কি ভেবেছো আমাদের কাউকে আস্ত রাখবে?

দেওয়ালের গায়ে ঝোলান রাইফেলটা পেড়ে নিয়ে, তার ইস্পাতের চোংয়ের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে অতিমাত্রায়

শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে ভবানীপ্রসাদ বলে : জীবনের জুয়ো খেলায় হার জিৎ আছেই মহীতোষ! কিন্তু যতক্ষণ ভবানীপ্রসাদের হাতে রাইফেল আর গুলি আছে, ততক্ষণ সে এ দুনিয়ায় কাউকেই ডরায় না। তুমিত জান, এগারটা বাঘ আমি জীবনে মেরেছি, এবং আমার হাতের নিশানা আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় নি একবারও!

তুমি কি পাগল হলে ভবানীপ্রসাদ?

পাগল! কঠিন হাসি হেসে ওঠে ভবানীপ্রসাদ : না, পাগল এখনো হইনি, তবে মুখের সামনে যখন সোনার পেয়ালা তুলেছি, কতকগুলো জংলীর ভয়ে সেটা আমার হাত হ'তে নিশ্চয়ই আজ আর নামবে না।

বাইরে গোলমালটা আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

ভবানীপ্রসাদ রাইফেলটা হাতের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে দৃঢ় সংযত পদে অগ্রসর হয়।

ওকি, কোথায় যাও, মহীতোষ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

আঃ পথ ছাড়! Don't be silly! ওদের জানিয়ে দিতে চাই যে আমরাও নিরস্ত্র নই।

না, তোমাকে গুলি ছুড়তে দোবো না আমি।

প্রবল এক ধাক্কা দিয়ে ভবানীপ্রসাদ মহীতোষকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয় : coward! ভবানীপ্রসাদ আজ সত্যই যেন ক্ষেপে গেছে : হিংস্র বন্য পশুর মত আজ যেন সে তার ধারাল বাঁকানো নখ বিস্তার করেছে।

ভবানী প্রসাদ!···চকিতে মহীতোষ নিজেকে সামলে নিয়ে

দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ায়, মহীতোষের কণ্ঠস্বরে ভবানীপ্রসাদও চমকে গিয়েছিল, সেও বিস্ময়ে ততক্ষণ ফিরে দাঁড়িয়েছে।

মহীতোষের হাতে রিভলভার, তার নলটা ঠিক ভবানীপ্রসাদের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত।

ভবানীপ্রসাদ স্থির নির্বাক, অকম্পিত! ঘূর্ণমান চক্ষু তারকা যেন দু'খণ্ড জ্বলন্ত অংগার।

তুমি!···তুমি আমাকে গুলি করবে মহীতোষ?

প্রয়োজন হলে দ্বিধাবোধ করবো না। শোন ভবানীপ্রসাদ, এক পা যদি এগিয়েছো কি, কুকুরের মতই I will shoot you down! আজ আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, তুমিই আমার জীবনের শনি! যেদিন থেকে তোমার সংগ নিয়েছি, ক্রমে দিনের পর দিন ধাপের পর ধাপ, আমি অবনতির পথে নেমে চলেছি!

তাহলে তুমি আজ দীর্ঘকাল ধরে আমার সংগে বন্ধুত্ব করে শেষে এই অভিযোগ আনছো, যে আমিই তোমার অধঃপতনের কারণ!···

অস্বীকার করতে পার তুমি সে কথা আজ ভবানীপ্রসাদ?

অস্বীকার! না, কারণ অস্বীকার করলেও তোমার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তা আজ আর বদলাবে না।

বাইরে গোলমালের শব্দটা যেন আরো বেড়ে ওঠে! ক্রুদ্ধ সাঁওতালরা ক্রমেই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্ছে।

ঘরের মধ্যকার হ্যারিকেন বাতিটা হঠাৎ এমন সময় দপ্ দপ্ করে উঠে।

বোধ হয় বাতির তেল ফুরিয়ে এসেছে, এবারে হয়ত নিভে যাবে। যাক! নিভে যাক। অন্ধকারই ভাল!

শোন মহীতোষ, এসব বুঝাপড়া পরে করলেও চলতে পারে কিন্তু শিয়রে আমাদের এখন মহাবিপদ, জংগলী, বুনো ওরা, কাউকে সত্যিকারের হয়ত গুলি করে মারবার নাও প্রয়োজন হ'তে পারে, দু'চারটে ফাঁকা আওয়াজ শুনলেই ওরা পালাতে হয়ত পথ পাবে না।

ঠিক্ তা না হ'য়ে উল্টোটাও ঘটতে পারে; জংলী ও বুনো বলেই ওদের আমার বিশ্বাস নেই!

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস।

হঠাৎ এমন সময় দপ্ দপ্ করে বার দুই বাতির শিখাটা লাফিয়ে উঠে দপ্ করে নিভে গেল একেবারে।

মুহূর্তে নিকষ কালো অন্ধকারে সমগ্র ঘরখানি যেন গ্রাস করে নিল।

নিষ্ঠুর সশব্দ হাসি হেসে ওঠে ভবানীপ্রসাদ: মহীতোষ, পাশার দান উল্টে গেল বন্ধু!

Now each other try our own luck!

সংগে সংগে রাত্রির স্তব্ধ জমাট নিঃস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ভবানীপ্রসাদের হাতের রাইফেল অগ্নুদ্গার করলে: প্রচণ্ড একটা শব্দ···দুম্···

একটা আর্ত অস্ফুট চিৎকার করে মহীতোষ পড়ে যায়, ভবানীপ্রসাদ, শয়তান! বিশ্বাসঘাতক! হা, হাঃ হাঃ করে নিষ্ঠুর ভয়ংকর হাসি হেসে ওঠে ভবানীপ্রসাদ, তার সেই

ভয়ংকর হাসির শব্দ চারিদিকের অন্ধকারে ভৌতিক বিভীষিকার মতই ছড়িয়ে পড়ে।

সদর্পে রাইফেলটা হাতে নিয়ে ভবানীপ্রসাদ খোলা অন্ধকার ছাদের প্রাচীরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হরবিলাস বৃদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এককালে মিঃ হুডের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেনঃ পরবর্তী কালে চাকুরী থেকে রিটায়ার করে মিঃ হুড্ যখন রায়পুর কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে এলেন, হরবিলাসও তার কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন, অথচ অভাব অনটনে কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে, হরবিলাসকে এনে নৃসিংহ গ্রামের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন মিঃ হুড্ তাই।

অত্যন্ত নির্বিবোধী শান্ত প্রকৃতির হরবিলাস, বহুকাল আগেই তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল, সংসারে একা মানুষ, এখানে এসে যেন মনে শান্তি পেলেন।

নির্ঝঞ্ঝাট্ জীবন!

একটা ঘরে পড়ে থাকতেন, এত বড় প্রাসাদ খালিই পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে ভবানীপ্রসাদ শাল কাঠের দালালী নিয়ে এখানে এলো।

ভবানীপ্রসাদের মৌখিক অমায়িক ভদ্র ব্যবহারে হরবিলাস মুগ্ধ হয়ে তার সংগে ব্যবসার আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে ভবানীপ্রসাদ আসা যাওয়া করতে লাগল ব্যবসার সূত্র ধরে।

এবারে দিন সাতেক হলো এখানে এসে উঠেছে।

গোলমালে হরবিলাসের ঘুম ভেংগে গেল। তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে এলেন, ব্যাপার কি দেখতে!

প্রাসাদের লৌহ ফটক্ খুলে দেবার জন্য সাঁওতালরা তখন গোলমাল করছে ; হরবিলাস ভ্যাবাচ্যাকা!

সর্দার বলছে : আমাদের রাজাকে তোরা আট্কে রেখেছিস ওকে ছেড়ে দে!

ঠিক এমন সময় রাইফেলের গুলির শব্দ চারিদিক সচকিত করে দিল আচম্কা।

হরবিলাস চম্কে এদিক ওদিক তাকাল।

সাঁওতালরাও কম বিস্মিত হয় নি।

এবং তাদের সেই বিস্ময় ভাল করে না কাটতেই ছাদের উপর হ'তে পর পর দু'বার দুম্ দুম্ করে গুলি বর্ষণ হলো সমবেত সাঁওতালদের 'পরে।

চারিদিকে একটা গোলমাল, বিশৃংখলা ও চিৎকার।

সাঁওতালের দল ক্ষেপে একেবারে হৈ হৈ করে চিৎকার করে ওঠে!

আবার গুলির শব্দ : এবারে ওরাও তীর ধনুক চালাতে সুরু করলে।

—চোদ্দ— —যুদ্ধ—

যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়।

নীচে প্রায় শ'খানেক সাঁওতাল, হাতে তাদের তীর ধনুক, লাঠি, সোটা।

উপরে ছাদের প্রাচীরের ওদিক হ'তে অদৃশ্য হাতে গুলি বর্ষণ চলে মুহুর্মুহু !...

রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার যেন চুরমার হয়ে যায়।

সহসা একটা বিষাক্ত তীর এসে হরবিলাসের ঘাড়ে বিদ্ধ হয়। একটা আর্ত চিৎকার করে হরবিলাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অজস্র রক্তক্ষরণ সুরু হয়।

* * * *

ওদিকে মিঃ হুড্ ছোটখাটো একটা পুলিশ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন নৃসিংহ গ্রামের রায়প্রাসাদাভিমুখে। সংগে কিরীটি, শম্ভু আর খ্যাপাকে ইচ্ছা করেই সংগে আনলেন না। খ্যাপারও ইচ্ছা ছিল না আসবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখে। পুলিশ বাহিনীর নেতা হয়ে এসেছেন স্বয়ং সুপার মিঃ নরম্যান্।

তখনো ভাল করে ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি ঃ রাত্রির অন্ধকার আবছা হয়ে এসেছে মাত্র।

প্রাসাদের প্রাচীরে আড়াল থেকে ভবানীপ্রসাদ গুলি চালাচ্ছে। আর নীচ থেকে উন্মত্ত সাঁওতালের দল বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ছে।

ভীষণ হৈ চৈ ও গোলমাল : সাঁওতালদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হয়েছে : তারা বুনো পশুর মতই ক্ষেপে উঠেছে।

দূর থেকে ঐ অবস্থা দেখে মিঃ হুড্ ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতেই পারলেন না, এবং ব্যাপারটা ভাল করে তলিয়ে বুঝবার আগেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে গুলি চালাবার জন্য মিঃ নরম্যান আদেশ দিলেন।

মিঃ নরম্যান এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, অল্পবয়সী যুবক। মাত্র কিছুকাল হলো আই, পি, তে ভর্তি হয়েছে, তরুণ যুবক, অল্পেতেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে; তাছাড়া লোকটা অসাধারণ দাম্ভিক। সেও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে আদেশ দিল : Fire ! Fire !

সংগে সংগে কুড়ি পঁচিশটা রাইফেল একসংগে ঘোর রবে অগ্ন্যুদ্গার করে উঠল।

প্রথম রাউণ্ডেই বহু সাঁওতাল হতাহত হলো।

ব্যাপারটা তারাও ঠিক বুঝতে পারল না, ফলে তারাও মার মার শব্দে এগিয়ে এল ঝড়ের বেগে। তারাও ভাবলে এরাও বুঝি তাদের প্রতিপক্ষই শত্রু।

দু'পক্ষে যুদ্ধ বেধে গেল ঘোর রবে।

একদল ইতিমধ্যে লোহার গেট ভেংগে প্রাসাদে গিয়ে ঢুকেছে।

রাইফেলের মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণের মুখে ওরা দাঁড়াতে পারে না, ওরা হটে গিয়ে সবাই প্রাসাদে গিয়ে ঢুকল।

পুলিশের দল প্রাসাদের বাইরে, সাঁওতালরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে।

ভবানী প্রসাদও ব্যাপারটা বুঝে উঠ্তে পারল না; সে কতকটা হতভম্ব হয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়।

*    *    *    *

মহীতোষ ভবানীপ্রসাদের গুলিতে নিহত হয়নি, তার কোমরে গুলিটা এসে লেগেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ও রক্তস্রাবে প্রথমটা সে অসহ্য ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে মহীতোষকে মৃত ভেবে ভবানীপ্রসাদ ছাদে গিয়ে গুলি চালাতে সুরু করেছে।

নড়বারও যেন ক্ষমতা নেই আর মহীতোষের।

অল্পক্ষণ মহীতোষ একই ভাবে পড়ে থাকার পর ধীরে ধীরে কোনমতে উঠে বসে; রিভলভারটা পাশেই ছিট্‌কে পড়েছিল, আসলে অবিশ্যি মোটেই সেটা গুলি ভরা ছিল না, মহীতোষ কেবল ভবানীপ্রসাদকে ভয় দেখিয়েছিল। পাশের কক্ষে ড্রয়ের মধ্যে গুলি আছে, এবারে ওটায় গুলি ভরা প্রয়োজন।

বসে বসে ঘষটাতে ঘষটাতেই কোনমতে মহীতোষ পাশের ঘরে যায়, যুদ্ধ তখন চলেছে পুরোদমে।

ড্রয় থেকে কোনমতে গুলি বের করে রিভলভারটার চেম্বার ভর্তি করে নিয়ে, আবার তাঁর ঘর হতে ছাদে আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল।

ভবানীপ্রসাদ তখন গুলি থামিয়ে সবে স্থির হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে, তার পিঠ লক্ষ্য করে কোন মতে বসে বসেই মহীতোষ ট্রিগার টিপল।

একটা ক্রম্ করে শব্দ শোনা গেল এবং লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো না সে।

একটা আর্ত চিৎকার করে বসে পড়ল ভবনীপ্রসাদ।

হাঃ হাঃ করে মহীতোষ হেসে ওঠে।

আবার, আবার পর পর আরো পাঁচটা গুলি চালাল মহীতোষ ভবানীপ্রসাদকে স্থির লক্ষ্য করে, মহীতোষ যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে আজ।

নিদারুণ রক্তক্ষরণে ভবানীপ্রসাদ মাটির পরে লুটিয়ে হাঁপাতে থাকে।

এবারে মহীতোষ রিভলভারের চোংটা নিজের থুতনীর নীচে লাগিয়ে ট্রিগার টিপল; কিন্তু খট্ করে একটা শব্দ হলো মাত্র, কোন গুলি বের হলো না।

গুলি বের হবে কোথা হ'তে, চেম্বারে আর একটা গুলিও অবশিষ্ট ছিল না।

রাগ ও ঝোঁকের মাথায় ভবানীপ্রসাদকে গুলি করতে গিয়ে সমস্ত গুলিই যে চেম্বারের শেষ হ'য়ে গিয়েছে তা মহীতোষ একবারও ভাবেনি।

এতক্ষণ ধরে রক্তক্ষরণে মহীতোষ এত বেশী ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল যে, উত্তেজনা কেটে যেতে সে যেন একেবারে ভেংগে পড়ে। নিদারুণ যন্ত্রণা ও ক্লান্তিতে ও হাঁপাতে থাকে।

* * *

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক আগাগোড়াই সাঁওতালদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল ঃ

সে যা বন্দুক ও গোলা গুলি সংগ্রহ করেছিল, এতক্ষণ পর্যন্ত একটিও তার সে ব্যবহার করেনি। তার কয়েকটি বিশ্বস্ত সাঁওতালদের কাছেই সেগুলো জিম্মা ছিল।

প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রথমেই সে উপরের তলার দিকে ছুটলো, সংগে দু'তিন জন সাঁওতাল অনুচর, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি নিয়ে।

সুবিনয় মল্লিকের এ প্রাসাদত' আর অপরিচিত নয়, এর প্রতিটি অলি খুঁজি ওর নখদর্পনে।

উপরের তলায় একখানা অতি সুরক্ষিত ঘর আছে ও জানত, সেই ঘরে এসে ও দরজা আটকে দিল।

এবারে যুদ্ধ!···

মিঃ হুডের দল যখন গুলি চালিয়ে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সাঁওতালরা বেশীর ভাগই ছত্রভংগ হয়ে এদিক ওদিক পালিয়েছে, এবং অবশিষ্টরা প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করছে, এমন সময় গুলি বর্ষণ আবার সুরু হলো প্রাসাদের অভ্যন্তর হ'তে।

ওরা থমকে দাঁড়ায়।

অগ্রগামী দু'তিনজন সশস্ত্র পুলিশ গুলিবিদ্ধ হ'য়ে ধরাশায়ী হলো।

গুলি আসছে একটার পর একটা।

হঠাৎ একটা গুলি লেগে পুলিশ সুপার আহত হলেন।

এদের দলে যেন একটা আতংক জাগে।

রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিকও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেনি। সেও সাঁওতালদের মতই ভেবছিল ওরা তাদের প্রতিপক্ষ। এবং ভেবেছিল ওরা বুঝি দল বল নিয়ে তাকেই ধরতে এসেছে।

যুদ্ধ চলতে থাকে।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গেল, কিন্তু পুলিশ বাহিনী কোন মতেই অগ্রসর হতে পারে না।

প্রাসাদে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না।

পুলিশ বাহিনী হটে এলো।

আবার অল্পক্ষণ বাদে যেমন তারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করে, প্রাসাদের অভ্যন্তর হতে গুলিবর্ষণ সুরু হয়।

অনেক পুলিশ হতাহত হয়েছে, ইতিমধ্যেই আহত গুলিবিদ্ধ সুপার মিঃ নরম্যান্‌কে রায়পুরে অন্যান্য আহতদের সংগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং শহরের হেডকোয়ার্টারে সংবাদ পাঠান হয়েছে জরুরী, আরো পুলিশ ফোর্স পাঠানর জন্য।

একদিন নয় দু'দিন নয়, পাঁচ দিন কেটে গেল, কিন্তু তথাপি পুলিশ বাহিনী প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারলে না।

নতুন পুলিশ ফোর্স এখনও এসে পৌছয় নি।

প্রাসাদ ত নয় যেন সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। একটা সামান্য ঘটনা যে এমন ঘোরালো জটিল হয়ে উঠবে কেই বা ভাবতে পেরেছিল?

দ্বিতীয় দিন প্রাতে পাশের একটা ঘরে ছাদের সংলগ্ন, আহত, রক্তাপ্লুত ও অবসন্ন মহীতোষকে সর্দার যখন দেখতে পেল, তখন তাকে টানতে টানতে গিয়ে একেবারে সুবিনয় মল্লিকের নিকট হাজির করে।

বিস্মিত রাজাবাহাদুর ওদের দিকে তাকায়ঃ কে এ লোকটা সর্দার? একে কোথায় পেলে?

তাত জানি না রাজা! পাশের ঘরটায় পড়ে ছিল।

রাজা! তা'হলে আপনিই রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক?

হাঁ। কিন্তু তুমি কে?...তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে সুবিনয় মল্লিক মহীতোষের দিকে তাকায়।

নমস্কার। আমার নাম মহীতোষ রায় চৌধুরী।

মহীতোষ রায় চৌধুরী?...

চিনতে পারবেন না আমাকে রাজাবাহাদুর, কারণ আমাদের সংগে পরস্পরের আজ পর্যন্ত কখনো সাক্ষাৎ হয়নি! তবে যে রক্ত হতে আপনার জন্ম আমারও সেই রক্ত হতেই জন্ম হয়েছিল! অবিশ্যি সে রক্ত সম্পর্ক খুঁজতে গেলে আমাদের উভয়কেই বহু বহু দূর পেছিয়ে যেতে হবে।...কিন্তু সে সময়ই আর আমার নেই। শেষের কথাগুলো মহীতোষ অতি কষ্টে টেনে টেনে বলে। তারপর মৃদু একটু হেসে প্রায় বোজা কণ্ঠে বলেঃ

বড় পিপাসা, একটু জল দিতে পারেন রাজাবাহাদুর? ..

সুবিনয় মল্লিক পার্শ্বে দণ্ডায়মান একজন সাঁওতালকে জল আনতে বলেন।

সাঁওতালটা জল নিয়ে আসে।

শোয়া অবস্থাতেই কোন মতে অতিকষ্টে মহীতোষ বোধ হয় তার জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবারণ করে : আঃ আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে রাজাবাহাদুর; মহীতোষ হাঁপাতে থাকে।

সত্যিই কোমর হতে নীচ পর্যন্ত দেহের অংশ যেন ফুলে উঠেছে, নিম্নাংশ টুকু সম্পূর্ণ অসাড়।

সমস্ত মুখখানা অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে যেন একেবারে শাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

লোভের উপযুক্ত শাস্তিই আমার মিলেছে; জীবনে ভগবান আমাকে পর্যাপ্তই দিয়েছিলেন; কিন্তু ভবানীপ্রসাদ···সেই আমার জীবনের শনি; মাত্র দু'বৎসরে সর্বস্ব আমার কোথায় কর্পূরের মত উবে গেল, টেরও পেলাম না। সোনার বাটিতে একদিন দুধ খেয়েছি, কিন্তু পরে তামার বাটিও জোটেনি :··· যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতি করে মহীতোষ : আর একটু জল।...

আবার মহীতোষকে জল দেওয়া হলো।

ভবানীপ্রসাদকে আমি ক্ষমা করিনি।···তাকে আমার আগেই যমালয় পাঠিয়েছি।

তোমরাই তাহলে প্রশান্তকে আমার চুরি করে এনেছো?

হাঁ।

কিন্তু সে এখন কোথায়? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছো?

এই বাড়ীরই পাতাল ঘরে।

পাতাল ঘরে!

হাঁ।...কিন্তু পাতাল ঘরের চাবীটা ভবানীপ্রসাদের কাছেই ছিল, সে কোথায় যে চাবীটা রেখেছে জানি না।

সুবিনয় মল্লিক আর মুহূর্ত দেরী করেন না। সর্দারকে নিয়ে নীচে পাতাল ঘরের দিকে ছোটেন।

পাতাল ঘর।

লোহার মতই শক্ত ও মজবুত তার দরজা এবং দরজার তালাটা হচ্ছে জার্মান তালা।

একমাত্র তার চাবী ছাড়া সে তালা খুলবার আর দ্বিতীয় কোন পন্থাই নেই।

অধীর ব্যাকুল সুবিনয় মল্লিক উত্তেজিত ভাবে বলেন: তালা ভেংগে ফেল সর্দার ; যদি তালা না ভাংগতে পারো, যে কোন উপায়েই হোক দরজা ভেংগে প্রশান্তকে আমার বের করে আনো ঘর থেকে, আমি উপরে চললাম।

সুবিনয় মল্লিক তক্ষুনি আবার ছুটে উপরে চলে এলেন। পুলিশ বাহিনী আবার তখন প্রাসাদে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে!

সুবিনয় তাড়াতাড়ি আবার রাইফেলটা তুলে জানালার ফাঁক দিয়ে গুলি চালাতে সুরু করে, কিছুক্ষণ গুলি বর্ষণের পর নীচের প্রতিপক্ষ আবার হটে যায়।

সুবিনয় ফিরে তাকাল মহীতোষের দিকে।

কিন্তু মহীতোষ তার কিছুক্ষণ আগেই শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছে। অসাড় নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহ। তবু সুবিনয় মহীতোষের দেহের নিকটে বসে ঝুঁকে পড়ে তার ঠাণ্ডা মৃত্যু

শীতল দেহটা ধরে ঠেলা দিয়ে ডাকেন: মহীতোষ, মহীতোষ ?

হতভাগ্য মহীতোষ আর সাড়া দেবে না এ জীবনে ! জীবনের খেলা তার শেষ হয়েছে ! অদৃশ্য বিচারকের দেওয়া লোভের চরম দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে সে তার কৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে ।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রাজা সুবিনয় মল্লিক উঠে দাঁড়ান ।

মহীতোষ ওদেরই কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় । কিন্তু জানা হলো না তার আসল পরিচয়টুকু ! অজ্ঞাতই রহে গেল তার পরিচয় ! এ বংশের রক্তে যে পাপ একদিন প্রবেশ করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত বুঝি আজও শেষ হলো না । কে জানে আরো কত প্রাণ দানে এ পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হবে । আর সত্যিই কোনদিন তা হবে কিনা তাই বা কে জানে !

—পনের— —পিতা ও পুত্র—

সাবল ও লোহার ভারী ডাণ্ডা দিয়ে মুহুমুহু আঘাতের পর আঘাত হেনে শেষ পর্যন্ত দু'জন সাঁওতাল পাতাল ঘরের দরজাটা ভেংগে ফেলতে সক্ষম হয় ।

ভাংগা দরজা পথে হুড় মুড় করে গিয়ে তারা পাতাল ঘরে প্রবেশ করে ।

প্রশান্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি, সে হতভম্ব হ'য়ে

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। কারণ একটি মাত্র হ্যারিকেন যেটা তারা রেখে গিয়েছিল, তৈলা ভাবে সেটা প্রায় নিভে আসছিল। দরজা ভেংগে ওদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে ও এগিয়ে এল।

ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের শেষ টিম্ টিমে্ শিখায় ও প্রশ্ন করে : কি চাও তোমরা ?

সর্দার হঠাৎ এগিয়ে এসে সবল দু'হাতে প্রশান্তকে আনন্দের আতিশয্যে বুকের মধ্যে চেপে ধরে : হামাদের রাজারে! হামাদের ছোট রাজা!

এবারে প্রশান্তও মুন্না সর্দারকে চিনতে পারে : কে সর্দার ?

হামাদের রাজা, তোকে হামরা বাঁচাতে আস্লো!···অনেক কষ্ট পেলো নারে রাজা?...আহা, হামার রাজারে। হামার রাজা!

এ, ক্ষণে প্রশান্তর বিস্মিত ভাবটা কাটতে সে বলে :

সর্দার ওরা আমাকে এখানে চুরি করে এনে আটকে রেখেছে, কিন্তু তুমি কি করে এ খবর পেলে বলত ?

তোর বাবা রাজাবাবু···বলতে গিয়ে হঠাৎ সর্দার থেমে যায়।

মনে পড়ে রাজার কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁর কথা সে প্রশান্তর কাছে বলবে না।

প্রশান্ত কিন্তু সর্দারের অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটা শুনেই চমকে্ উঠেছিল : কি! কি বললে সর্দার? কার কাছে খবর পেয়েছো বললে ?

ও কিছু না রাজা! বুড়ো হ'য়ে গেলাম, মাথারত ঠিক নেই, কি বলতে কি বলেছি।

না না আমাকে বল। বল আমি শুনতে চাই।

সব বলবো রে; সব তোকে হামি বলবো। এখন উপরে চল দেখি। সর্দার বলে, তারপর সর্দারের সংগে সংগে প্রশান্ত উপরে উঠে আসতে আসতে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়ে বলে ওঠে:

ও কিসের শব্দ সর্দার?

তোকে যারা ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের সংগে হামাদের যুদ্ধ চলেছে রে!…

যুদ্ধ! প্রশান্ত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, ব্যাপারটা এখনও যেন ও তেমন ভাল ক'রে বুঝতেই পারে না।

* * *

গুলি ভর্তি রাইফেলটা পায়ের কাছে মেঝেতে রাখা: রাজা বাহাদুর সুবিনয় মল্লিক ছোট একটা টুলের 'পরে দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ঝুঁকে বসে আছেন! ক্লান্ত অবসন্ন।

ওদের পদশব্দে মুখ তুলে তাকায়: কে?

রাজা!…সর্দার ডাকে।

প্রশান্ত এগিয়ে আসে: আমি প্রশান্ত, আপনি কে?

আমি!…কালো গগলসের কাচের অন্তরাল হতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রাজা সুবিনয় মল্লিক তার একমাত্র পুত্র ও অশেষ স্নেহের পাত্র প্রশান্তর দিকে তাকান।

কি বলবে আজ সুবিনয় মল্লিক! কি জবাব দেবে।

পুত্র আজ পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে, পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে পুত্র পিতার : তুমি কে?

অপরিসীম বেদনায় রাজা সুবিনয় মল্লিকের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

সমস্ত প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে, হৃদয়ের সমস্ত ভাষা আজ কণ্ঠ চিরে বের হয়ে আসতে চায় : ওরে! ওরে! আমি তোর বাপ! তোর হতভাগা খুনী পলাতক বাপ!

বিবেক গর্জন করে ওঠে : সাবধান! কি পরিচয় আজ তোমার আছে যে তুমি তোমার পুত্রকে দিতে পার! জান না কি তোমার সত্যিকারের পরিচয় পেলে আজ ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে?

রায়পুরের রাজা বাহাদুর, তুমি কি আজ ভীত?...পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠে নিজের পরিচয় দিতে কি আজ লজ্জিত?

সামান্য সম্পত্তির লোভে যেদিন ছোট ভাইটিকে এ পৃথিবী থেকে সরাবার জন্য জঘন্যতম হীন চক্রান্ত করেছিলে তখনত' কই ভীত হওনি! হওনি এতটুকু লজ্জিত?

যে ভাই তোমাকে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসত যার সমস্ত জীবন তোমার স্নেহের, যে বুকভরা একটি স্নেহের পশরা দিয়ে আজ তুমি তোমার একমাত্র সন্তানকে অভিষিক্ত করতে চলেছো, তার একটি মাত্র কণা পেলেও ধন্য হয়ে যেত! এ স্নেহ সেদিন তোমার কোথায় ছিল? সেই স্নেহভিক্ষু ভাইটিকে

জঘন্য চক্রান্তের মধ্যে ফেলে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধাবোধও করোনি, সেদিন ?

সেদিন ত কই তুমি তোমার বিবেকের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে এতটুকু দ্বিধা বা সংকোচও অনুভব করোনি, বিন্দু-মাত্রও ভীত হওনি! কই এসো! সামনে এগিয়ে এসে মুখোস খুলে পরিচয় দাও!

বললেন না আপনি কে? প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করে।

আমাকে···আমাকে তুমি পরিচয় দিলেও চিনবে না প্রশান্ত! সে বরং এক সময় হবে।

তবে আপনিই কি প্রাসাদে আমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখে যেতেন ?

হাঁ!

তাহলে আপনি জানেন, আমার বাবা কোথায় ?

জানি।

কোথায়? কোথায় তিনি. বলুন চুপ করে রইলেন কেন? বলুন তিনি কোথায় ?

তিনি···তিনি আমার সংগে···

ঠিক এই মুহূর্তে রাজা সুবিনয় মল্লিকের মুখের কথা শেষ না হতেই, একজন সাঁওতাল হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

মন্নু সর্দার এগিয়ে গেল : কি রে ঝণ্টু!

মাঝি, শিগীরি দেখবি আয়, রতন কাদের ধরেছে।

কে রে বেটা ?

তু দেখবি আয় না !

চলত !...

ওরা বললে হামাদের ছোট রাজাকে নাকি রক্ষা করতে এলো !

কে ? প্রশান্তও উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

নাম বলছে রায় বাবু না কি ! সর্দারকে ডাকছে।

নিশ্চয় কিরীটি বাবু ! মিঃ রায় ! কই কোথায় তিনি ! কোথায় ? চল ! শীঘ্র আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে !

মনু সর্দার, ঝণ্টু ও প্রশান্ত সকলে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

## —ষোল— —কিরীটি ও নির্মল—

কিরীটি যখন দেখলো মিঃ হুড ধীরভাবে ব্যাপারটা আগাগোড়া বিচার না করেই, পুলিশ সুপার নরম্যানের সংগে সব জোট পাকিয়ে তুললে, এবং রীতিমত যুদ্ধই বেধে গেল, সে তখন নিরুপায় হয়েই যেন ওদের সবার অলক্ষ্যে ভীড়ের মধ্য হতে গা ঢাকা দিয়ে সরে একটা নির্জন জায়গায় চলে গেল। ভাবে কি এখন করা উচিত ?

ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে ঠেকছে ! এদের দলে সাঁওতালরা গিয়ে জুটলো কোথা হতে ? আর সাঁওতালরা যদি ওদের দলে যোগ দিয়েই থাকে, প্রথম দিকে ওরা প্রাসা-

দের বাইরে দাঁড়িয়েই বা প্রাসাদকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছিল কেন ?

** পরের ব্যাপারটা আরো গোলমেলে, নরম্যানের সৈন্যরা গুলি চালাতেই ওরা ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলে অনেকে, এবং এখন পর্যন্ত তারাই এদের সংগে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই যে তিন দিন ধরে ক্রমাগত গুলি চালিয়ে চলেছে, এরা এত গুলি পেল কেথায় ? আর এত আগ্নেয়াস্ত্রই বা কোথায় পেল ?

ন্যাপা বলেছিল প্রশান্তকে নৃসিংহ গ্রামের প্রাসাদের পাতাল কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সুব্রতর মুখে অবিশ্যি সে পাতাল কক্ষের কথা শুনেছিল।* কিন্তু কোথায় যে সে পাতালঘর এবং কোন পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয় তাই বা কে জানে ? সুব্রতর মুখেই কিরীটি একদিন শুনেছিল প্রধান গেট ছাড়া প্রাসাদে প্রবেশের পশ্চাতের অশ্ব ও হাতী শালের সামনে আরো একটা খিড়কী পথ আছে।

কিরীটি মুহূর্তে স্থির করে ফেলে সেই দরজা পথেই রাত্রির অন্ধকারে গোপনে প্রাসাদে প্রবেশ করবে।

কিন্তু চার দিন ক্রমাগত চেষ্টা করেও কিরীটি সে দিকে এগুতে পারলে না। প্রাসাদের সর্বত্রই প্রায় সাঁওতালরা ছড়িয়ে আছে, তাদের বিষাক্ত তীর এড়িয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

---

* মৃত্যুবান ( ২য় ভাগ ) দ্রষ্টব্য ঃ

* * ওদিকে রায়পুর প্রাসাদে গ্যাপা একাকী দুশ্চিন্তায় ছট্ ফট্ করছিল এমন সময় ওদের দলের নির্মলের সংগে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। দলপতির নির্দেশে সে দু' এক-দিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছিল। রায়পুরে ফিরে এসে লোক মুখেই সে সমস্ত সংবাদ শুনল। নৃসিংহ গ্রামে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে সে সংবাদও সে পেল।

তার অনুপস্থিতিতে এই কয়দিনে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে শুনে নির্মল স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পরের দিন নির্মল বললে: আমি আজই নৃসিংহ গ্রামে যাচ্ছি গ্যাপা।

গ্যাপা বিস্মিত কণ্ঠে বলে: সে কি! সেখানে গিয়ে তুঃ কি করবি? সেখানে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে।

চলুক! তবু যাবো!

তবু যাবি! তুই কি পাগল হলি?

না পাগল হই নি, আমিই তোদের মধ্যে একা তোদের রাজাবাহাদুর ও ভবানীপ্রসাদের আসল পরিচয়টা জানি! সেখানে গিয়ে মিঃ হুডের কাছে সব খুলে বলবো! শয়তান! আমাদের দলে এনে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! আমার নামও নির্মল! আমিও ছেড়ে কথা বলবো না। মুখোস টেনে খুলে সব প্রকাশ করে দেবো। নির্মল সত্যি সত্যিই চলে গেল নৃসিংহগ্রামের দিকে পরের দিন সকালেই একটা পা-গাড়ীতে চেপে।

এত বড় বেইমানী, নির্মলের সমস্ত মনে যেন একেবারে

আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হন হন্ করে নির্মল সাইকেলের প্যাডেল করে চলে।

* * বিমূঢ় কিরীটি বৈকালের পড়ন্ত আলোয় একা একা শালবনীর নির্জন রাস্তাটার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আজ পাঁচ দিন, এখনও কিরীটি প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে নি।

অদূরে ধূলিধূসরিত ক্লান্ত অবসন্ন সাইকেলআরোহী নির্মলকে দেখে কিরীটি অবাক বিস্ময়ে নির্মলের দিকে চেয়ে থাকে।

গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় বলতে গেলে সকলেই ইতিপূর্বে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে রায়পুরের দিকে চলে গেছে।

গ্রাম প্রায় নির্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সময় নির্মলকে গ্রামের দিকে যেতে দেখে কিরীটি যদি বিস্মিতই হয় তার কোন দোষ নেই।

কিরীটি অগ্রসর হয়েই ডাকে : ও মশাই! ও সাইকেল-ওয়ালা মশায়, শুনছেন?

নির্মল সাইকেল হ'তে নেমে এগিয়ে আসে : কি বলছেন?

আপনাকে ত কখনো এদিকে দেখিনি? কোথা থেকে আসছেন?

কেন বলুনত? সে খবরে আপনার প্রয়োজন কি?

না এমনিই আর কি, শোনেন নি কি এখানে ভীষণ গোলা-গুলি চলছে, গ্রামের লোকেরা ভয়ে এখান হ'তে প্রায় সবাই চলে গেছে!

শুনেছি!

তাই বলছিলাম এই সময় আপনি এখানে আসছেন !

আপনি বুঝি এখানেই থাকেন ?

আর মশাই সে দুঃখের কথা বলেন কেন ? রায়পুরের প্রাসাদ হতে যে দল এসেছিল তাদের সংগেই এসেছিলাম, এখানে এসে এই বিভ্রাট !...

মশাইয়ের নাম ?

সত্যি বলবো না মিথ্যা বলবো ? কিরীটি স্মিতভাবে বলে।

কেন ?

মানে যাই বলিনা কেন ? আপনাকে সেটাই বিশ্বাস করতে হবেত' ?

তা যা বলেছেন। মনে হচ্ছে আপনি লোক নেহাৎ খারাপ হবেন না। সিগ্রেট আছে মশাই ?

কিরীটি মৃদু হেসে বলে : আছে বটে তবে সিগ্রেট্ নয়, সিগার !

সিগার আছে ? ভাল brand ?

হাঁ, খাস্ বার্মা সিগার।

দিন মশাই দিন, অনেক দিন খাই না !

কিরীটি একটা সিগার বের করে দেয়।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নির্মল কিরীটির দেওয়া সিগারে অগ্নিসংযোগ করে, অত্যন্ত আয়েষের সংগে একটি সুদীর্ঘ সুখটান দিয়ে মৃদু হেসে বলে : চমৎকার !···

সন্ধ্যার আসন্ন ধুসর ছায়া চারিদিকে নেমে আসছে : সহসা মূহুর্মুহু বন্দুকের গুলির দূরাগত আওয়াজ শোনা গেল।

ওকি! নির্মল প্রশ্ন করে।

firing চলেছে!

firing?

হাঁ, আজ পাঁচ দিন থেকেই ত ঐ রকম যুদ্ধ চলেছে!

পুলিশের লোকেরা তা'হলে এখনো ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পারে নি বলুন?

না।

আশ্চর্য ত!

প্রাসাদে এখনো কেউ প্রবেশ করতেই পারলে না ত'. ছেলেটাকে উদ্ধার।

I know a secret passage. প্রাসাদে প্রবেশের একটা গুপ্ত দ্বার আমার জানা আছে! কিন্তু…

কিন্তু কি? কিরীটি একান্ত উদগ্রীব হয়ে বলে।

আগে মিঃ হুডের সংগে আমি দেখা করতে চাই!

কেন বলুন ত?

কিংবা কিরীটি রায়ের সংগে দেখা হলেও আমার চলবে'

আশ্চর্য। আমারই নাম কিরীটি রায়!…আপনি?

আপাততঃ শুধু আমার নাম নির্মল বলেই জানুন। এ ভালই হলো একপক্ষে আপনার সংগে দেখা হয়ে এখানে, আসলে পুলিশের ওখানে সরাসর যেতেও কেমন যেন মন আমার সায় দিচ্ছিল না।

আমাকে সব কথা খুলে বলুন নির্মল বাবু? কিরীটি অনুরোধ জানায়। একটুক্ষণ কি ভেবে নির্মল শেষ পর্যন্ত বলে:

বিষ্টু চরণ আমার অনেকদিনকার এবং বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, জানি না আপনি তার সব কথা শুনেছেন কি না।

কিরীটি বাধা দেয় ঃ জানি, ভবানী প্রসাদ তাকে খুন করেছে।

হাঁ! that শয়তান Scoundrel ভবানী প্রসাদ! তাকে একবার হাতের কাছে পেলে তার গলা টিপে শেষ করে দিতাম, দেখুন মিঃ রায়, আমরা চোর ডাকাত বদমাস্ হলেও আমাদের একটা নীতি আছে! ভবানীপ্রসাদ is a traitor! সে এভাবে আমাদের দলের লোককে হত্যা করে সেই নীতি ভংগই করেছে!

এতক্ষণে যেন কতকটা কিরীটি নির্মলকে বুঝতে পারে, এবং মুহূর্তে সে নিজের সংকল্প ঠিক করে নেয়ঃ নির্মল বাবু, আপনি আমাকে বন্ধু বলেই জানবেন। আমিও এখানে এসেছি প্রশান্তকে উদ্ধার করতে শত্রুর কবল হ'তে এবং ঐ প্রাসাদের গুপ্ত পাতাল ঘর হ'তে যেমন করেই হোক প্রশান্তকে আমাদের উদ্ধার করে আনতেই হবে। আমি গত কয়েকদিনের ঘটনা দেখে বুঝতে পারছি, এভাবে সামনাসামনি যুদ্ধ করে প্রাসাদে শীঘ্র প্রবেশ করা অসম্ভব। যতক্ষণ ওদের হাতে গোলাগুলি আছে, ওরা আমাদের গতি রোধ করবেই, এবং শেষ পর্যন্ত রসদ ফুরিয়ে গেলে যখন আর কোন উপায়ই থাকবে না তখন হয়ত পথ ছেড়ে দিলেও দিতে পারে। কিন্তু তখন তারা নিশ্চয়ই desperate হয়ে উঠবে, এবং সেই সময় প্রশান্তকে খুন করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা আমাদের সময় আর

নষ্ট করতে পারি না। Sooner the better, যত তাড়া তাড়ি প্রাসাদে প্রবেশ করা যায় ততই ভাল। আপনি বলছিলেন একটু আগে, আপনি প্রাসাদ প্রবেশের একটা Secret passage জানেন। চলুন সেই পথে আজই রাত্রে আমরা প্রাসাদে প্রবেশ করি!

বেশ, আপনাকে আমি সে পথ দেখিয়ে দেবো। ভবানী-প্রসাদ।...তাকে আমি সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না। ভবানী প্রসাদ ও তার সংগী মহীতোষের real history আপনি হয়ত জানেন না মিঃ রায় কিন্তু আমি জানি।

সব শুনবো কিন্তু তার আগে চলুন আপনি পরিশ্রান্ত, আগে কিছু খেয়ে বিশ্রাম করে নিন; সামনে আমাদের গুরু কর্তব্য ভার।

* *

শুনেছি মহীতোষ চৌধুরী, নির্মল বলতে সুরু করে: মহীতোষের মার ঠাকুর্দা ছিলেন রায়পুরের এই মল্লিক রাজাদের বাড়ীরই ছেলে, রাজা যজ্ঞেশ্বরের খুড়তোত ভাই রাজেশ্বরের ছেলের পৌত্রের একমাত্র মেয়ে জ্ঞানদা দেবীর একমাত্র পুত্র হচ্ছেন মহীতোষ চৌধুরী, মহীতোষের মার ঠাকুর্দা তার অংশ বেঁচে দিয়ে পাটনায় এসে বসবাস সুরু করেন, শোনা যায় সে যুগের ছেলে হয়েও মহীতোষের মার ঠাকুর্দা নিজের উপার্জিত অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন পৈতৃক অর্থের চাইতে, এবং যে অর্থ নিয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ছেড়ে আসেন, তাই দিয়েই গমের ব্যবসা সুরু করেন।

অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে ও সমস্ত জীবন গুরু পরিশ্রম করে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে রেখে যান। যে সময় পৈতৃক ভিটা ছেড়ে মহীতোষের মার ঠাকুর্দা চলে আসেন পাটনায়, তখন তাঁদের অবস্থা এমন বিশেষ কিছু ভাল ছিল না। মল্লিক বাড়ীর যা কিছু প্রতিপত্তি ও যশ রাজা যজ্ঞেশ্বরের আমলেই গড়ে ওঠে।

এবং 'রাজা' উপাধি যজ্ঞেশ্বরেরই উপার্জিত।

রত্নেশ্বর নানাবিধ ব্যবসার দ্বারা সম্পত্তিকে আরো বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন।

তারপর ?

তারপর মহীতোষের মার ঠাকুর্দা মারা যাবার পর একমাত্র পুত্র অর্থাৎ মহীতোষের মাতামহ তাঁর পৈতৃক সম্পত্তিকে আর বৃদ্ধি করতে পারেন নি বটে, তবে নষ্টও করেন নি। মহীতোষেয় মাতামহও কোনমতে শশুরেরর সম্পত্তি নিয়ে দিন কাটিয়ে যান, কিন্তু মহীতোষ তার যৌবনেই উচ্ছৃংখল হ'য়ে উঠ্‌লেন; তাঁর জীবনে ভবানীপ্রসাদ এলো যেন মূর্তিমান শনিগ্রহের মত। ভবানীপ্রসাদও ধনী পিতার পুত্র, উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু সংগদোষে ও জুয়াখেলে সে তার পিতার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে সহরের সব ধনীর পুত্রদের ঘাড়ে চেপে ফুর্তি ও মজা লুঠ্‌তে থাকে। মহীতোষের যখন মাত্র ২১ বৎসর বয়স, তার পিতার আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু হয়, এবং প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি তার হাতে এল। তারপর ভবানীপ্রসাদের সাহচর্যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহীতোষ তার পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি

কোথায় উড়িয়ে দিল! চারিদিকে ধার ও দৈন্য; অবস্থার চরম দুরবস্থা, এই সময় রায়পুরের মল্লিক বাড়ীর সুহাস নিহত হলো; মামলা সুরু হলো। তারপর একদিন শোনা গেল, খুনী রাজা সুবিনয় মল্লিক পলাতক, এবং তার কিছু কাল পরে শোনা গেল আসানসেলে সে ছদ্মবেশে গোপন থাকা কালীন নিহত হয়েছে। ভবানীপ্রসাদ মহীতোষকে প্রলোভিত করলে, এবং তাকে বোঝালে রায়পুরের শেষ বংশধর ঐ প্রশান্তকে কোনমতে সরাতে পারলে রায়পুরের ঐ বিশাল সম্পত্তিকে সে নির্বিঘ্নে করায়ত্ব করে বাকী জীবনটা নিশ্চিন্ত আরামে কাটাতে পারবে।

মহীতোষও সহজেই প্রলোভিত হয়ে পড়ল এবং জোড় জোড় করে সকলে এসে কাজে নামল। এমন সময় প্রশান্ত এলো ছুটিতে রায়পুরে বেড়াতে।

ঠিক হলো প্রশান্তকে চুরি করে কোন মতে কোথাও চির দিনের মত সরিয়ে ফেলে, রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। সেই মত Planও সব করা হলো। সেই Plan মাফিকই আমি বিষ্টুচরণ ও ন্যাপা এখানে এলাম।

ভবানীপ্রসাদ আগেই কাষ্ঠব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসে নৃসিংহ গ্রামের ষ্টেটে হরবিলাসের সংগে আলাপ জমায়। মহীতোষ লোকটা যতই দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃংখল হোক না কেন আসলে কিন্তু অত্যন্ত ধর্মভীরু ও তরলমতি।

ভবানী প্রসাদ তাকে যেন যাদু করে ফেলেছে। সাপের চাইতেও সাংঘাতিক ওই শয়তান ভবানীপ্রসাদ।

এসব কথা আপনি জানলেন কি করে ?

বিষ্টুর মুখেই এসব আমার শোনা। গোপনে লুকিয়ে একদিন ভবানীপ্রসাদ ও মহীতোষের আলাপ আলোচনা ও শুনে গোপনে গোপনেই ও খবর নেয় এবং সব জানতে পারে।

—সতের— —যবনিকা—

আবার রাত্রির ভয়াবহ অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেছে।

কিরীটি আর নির্মল নিঃশব্দে তাদের রাত্রির অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

উভয়পক্ষেই যুদ্ধ স্পৃহাটা যেন কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত আছে।

বিকাল চারটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সমানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ চালিয়েছিল।

মিঃ হুড্‌কে সব বলা প্রয়োজন, তাই কিরীটি সংক্ষেপে তার রাত্রের অভিযানের ব্যাপারটা তাকে জানিয়েছে!

মিঃ হুড্ সানন্দে মত দিয়েছেন।

কিরীটি বলেছিল : আমি প্রাসাদে প্রবেশ যদি করতে পারি কোনমতে এবং ভিতরের অবস্থা আশাপ্রদ মনে হয়, তাহলে বাঁশী বাজিয়ে আমি সংকেতধ্বনি করবো, তোমরাও আর তাহলে অপেক্ষা না করে একেবারে direct charge করে প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করবে।

O. k.... তাই হবে মিঃ রয়।

* * *

কিরীটি আর নির্মল প্রায় মধ্যরাত্রে যখন চারিদিক প্রায় সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে তখন প্রাসাদের গোপন প্রবেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হলো।

হাতীশালের পশ্চাৎ দিক্ দিয়েই একটা ছোট দরজা আছে: ঐ পথে প্রয়োজন হলে প্রাসাদে গোপনে প্রবেশ করা যায়।

নির্মল সেটা আগে হতেই জানত।

পথ খুঁজে নিতে ওদের তেমন বেগ্ পেতে হয় না।

অন্ধকারে নিঃশব্দে দু'জনে ছায়ার মত সেই দ্বারপথে এসে দাঁড়াল।

কোথায় কোন অন্ধকারে একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে: ক্যাঁ ক্যাঁ চঁ...।

ক্ষণিকের জন্য ওরা থমকে দাঁড়ায়।

ভাগ্যক্রমে দরজাটা ঠেলতেই দেখা গেল দরজাটা খোলা: বোধ হয় ঐ পথের সন্ধান সাঁওতালরা জানত না; বা রাজা সুবিনয় মল্লিকও মনে করে ওদের সাবধান করে দিতে অবসর পান নি!

সরু একটা ছোট অন্ধকার গলি পথ: দু'জনে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে অগ্রসর হয়।

*　　*　　*

এদিকে রাত্রি যখন প্রায় দেড়টা, সহর হ'তে নতুন পুলিশ ফোর্স এসে হাজির। তাদের সংগে একটা মেসিন গানও এসে গেছে।

মিঃ হুড্ ও পুলিশের হেড্ অফিসার উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

নতুন দলের সংগে একজন তরুণ ইউরোপীয়ান লেফ্টেনেন্ট্ অফিসার ও এসেছেন। সে বলে : দেরী করে কি হবে? এখুনি আমরা প্রাসাদ attack করবো। ওরা হয়ত এখন নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছে, এই মস্তবড় সুযোগ। Golden opportunity.

মিঃ হুড্ও কি ভেবে বলেন : বেশ তাই হোক!

ওরা আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে।

*　　　*　　　*

সরু গলি পথটা পার হ'য়ে কিরীটি ও নির্মল এসে একটা অন্ধকার অলিন্দপথে উপস্থিত হলো।

নির্মল, তুমি জান পাতাল ঘরটা কোথায়?

নাত !...

তবে ?

ঠিক এমনি সময় অনেকগুলো লোকের মিলিত পদ শব্দ শোনা গেল ও সেই সংগে একটা আলো দেখতে পাওয়া গেল।

ওরা চকিতে এক পাশে সরে দাঁড়ায় : লোকগুলো কিছু দূরে একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল!

ব্যাপারটা ঠিক ওরা বুঝতে পারলে না।

এমন সময় অতর্কিতে কে বা কারা যেন নিশঃব্দে ওদের দু'জনকেই পশ্চাৎ দিক হ'তে জাপ্টে ধরলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিরীটি প্রথমটায় একটু হক্চকিয়ে গেলেও মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে অদৃশ্য আক্রমণকারীর

কবল হ'তে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না ঃ আরো চার পাঁচ জন লোক এসে ওদের বন্দী করে ফেলল ইতিমধ্যে।

ঐ সময় একজন একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল ঃ মশালের রক্তিম আলোয় ওরা দেখলে, আক্রমণকারীরা কয়েকজন সাঁওতাল ঃ কে তুরা, ইখানে কি করতে এসেছিস ?

মুহূর্তে কিরীটি নিজের সংকল্প ঠিক করে নেয়, বলে ঃ তোদের ছোট রাজাকে বাঁচাতে এসেছি। তোদের সর্দার কোথায় তাকে খবর দে। বলবি আমার নাম রায় বাবু।

সহসা এমন সময় মুহুর্মুহু বন্দুকের গুলির শব্দে চারিদিক আবার প্রকম্পিত হ'য়ে ওঠে !

কিরীটি শংকিত হয়ে ওঠে !

মন্নু সর্দার ও প্রশান্ত এসে হাজির ঃ মিঃ রায় !

'প্রশান্ত !...কিরীটি বলে।

গুলির শব্দ ক্রমেই জোরালো হ'য়ে ওঠে !

মিঃ হুডের দল চার্জ করেছে নিশ্চয়ই।

কিরীটি বলে ঃ প্রশান্ত, এঁদের আমাকে ছেড়ে দিতে বল।

প্রশান্তর নির্দেশে সাঁওতালরা কিরীটি ও নির্মলকে মুক্তি দেয়।

কিরীটি আর সময়ক্ষেপ না করে উপরের সিঁড়ির দিকে ছোটে, প্রশান্ত ও সর্দার কিরীটিকে অনুসরণ করে।

কিন্তু রাজা সুবিনয় মল্লিকের ঘরের সামনে এসে দেখে দরজা হা হা করছে খোলা, ঘর খালি। কেউ সেখানে নেই।

তখন সকলে খোলা ছাদের দিকে ছোটে, কিন্তু ছাদে যাবার একটি মাত্র দরজা ওপাশ হ'তে বন্ধ!

ওরা সব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এখন ওরা কি করবে?

এদিকে প্রচণ্ড বেগে গুলি চালাতে চালাতে নীচের সৈন্য-বাহিনী প্রাসাদের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে ততক্ষণ।

সাঁওতালদের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তারা ক্ষেপে তীর চালাতে সুরু করল পাল্টা।

আহতের আর্তনাদে, ধোঁয়া বারুদের গন্ধে চারিদিক যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

* * *

ছাদের দরজার পরেই মেসিনগান বসিয়ে, লেঃ অফিসারটি গুলি চালাতে থাকে পাগলের মত।

অনেকক্ষণ গুলি চালাবার পর আর কোন সাড়া শব্দ ছাদের পর হ'তে পাওয়া যায় না।

লেঃ বলে: He must be dead! দরজাটা ভেংগে ফেল।

গুলিবিদ্ধ শতছিদ্র রুদ্ধ দরজাটা ভেংগে সকলে ছাদের পরে এসে প্রবেশ করে।

আকাশের অন্ধকার শেষ হ'য়ে এলো : চারিদিকে অস্পষ্ট আলোছায়ার খেলা ; সামনেই রক্তাক্ত আহত রাজা সুবিনয় মল্লিক পড়ে। ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে রাজা বলে : my mission is over ! আমাকে তোমরা ধরতে পারবে না।

কিরীটি মৃদু কণ্ঠে ডাকে : প্রশান্ত !...

এ্যাঁ !...

উনিই তোমার পলাতক পিতা রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক !

রাজাবাহাদুর চিৎকার করে ওঠেন : না না প্রশান্ত, মিথ্যা কথা ! বিশ্বাস করো না, আমি তোমার কেউ নয়, কেউ নয়। কেউ নয় !...বলতে বলতে সহসা বুক পকেট হতে একটা রিভলভার বের করে রাজা সুবিনয় মল্লিক আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন।

প্রশান্ত বাধা দিতে ছুটে যায় : বাবা ! বাবা !...

রিভলভার সমেত হাতটা ধরে ফেলে প্রশান্ত, কেড়ে নেবার চেষ্টা করে পিতার মুষ্ঠি হ'তে আগ্নেয়াস্ত্রটা : কিন্তু সফল হয় না।

টানাটানি চলতে থাকে : আঃ ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও : সহসা একটা গুলির সংগে সংগে একটা আর্ত চিৎকার করে প্রশান্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে সুবিনয় মল্লিকের পাশেই লুটিয়ে পড়ে !

কি হলো ! কি হলো ? সকলে চম্‌কে ওঠে !

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে ! দুর্বার নিয়তিকে ত' কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না ।

হায় ভগবান ! একি করলাম আমি ! একি করলাম ! আহত পশুর মত আর্তনাদ করে ওঠেন রাজাবাহাদুর সুবিনয় মল্লিক ।

সকলেই স্তম্ভিত !···বিমূঢ়, বাক্যহারা ।

কি মর্মন্তুদ, হৃদয়স্পর্শী দুর্ঘটনা !

বাবা !···ক্ষীণ স্বরে প্রশান্ত ডাকে !

বিমূঢ় সকলে আর একটা আচম্‌কা গুলির শব্দ শুনে চম্‌কে ওঠে !···

ঠিক থুতনীর নীচে পিস্তলের নল লাগিয়ে আহত সুবিনয় মল্লিক আত্মহত্যা করেছেন ।

* * *

রাত্রি ! দুঃখ নিশি কি পোহাল ?

যে বিষ রায়পুরের রাজবংশের ধমনীতে সংক্রামিত হয়েছিল, এতদিনে তার শেষ তর্পণ হলো কি ?

প্রশান্ত তার বুকের রক্ত দিয়ে অভিশপ্ত মল্লিক বংশকে শাপমুক্ত করে গেল কি ? কে এর জবাব দেবে ? কে ?

—শেষ—